মিহি ও মোটা কাহিনী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সূচিপত্র

মিহি ও মোটা কাহিনী

মিহি ও মোটা কাহিনী

টিকটিকি

দোতলা বাড়ী। সহরের যে অঞ্চল বেজায় সহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিন দিকে গাদা করা বাড়ীর চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তাছাড়া, এমন চেহারা বাড়ীটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসবর্ণ রহস্যের মত কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু ও সরলা খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বে-আবরু সমতল পিঠে পুরাণো বাদামীরঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায়না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশী।

দোতলা বাড়ী বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়ির যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচা-বন্দী দোতলার সিঁড়ি। অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই কোন দিকেই। দোতলায় থাকেন ইতিহাসের প্রফেসর, সদর দরজাটীর পাশে ছোট পিতলের ফলকে যিনি এম-এ। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব,

বাকী দুটি সদর দবজার উপবে কাঠের ফ্রেমলাগানো বঙীন টিনের মস্ত সাইনবোর্ডে যিনি প্রথিতযশা। দুটি দরজাই একটি ঘবেব, যাব বেশীব ভাগ জ্যোতিষার্ণবেব গণনালয, বাকীটুকু অন্দবেব প্যাসেজ। তিনটি সদব দবজাব মাঝেবটি দিযে ঢুকলেই ডাইনে দোতলাব সিঁড়ি আড়াল কবা দেযাল আব বাঁদে দুটি বই-ভবা আলমাবির বে-আবক্ক পিঠ। এগিযে এগিযে যখন অন্দবেব দরজা ডিঙিযে জ্যোতিষার্ণবেব আবছা অন্ধকাব সেঁতসেতে অন্দবে পদার্পণ না কবে প্রায আব উপায থাকে না, তখন দেখা যায, আলমাবিব দেযাল একেবাবে অন্দবেব দেযালে গিযে ঠেকেনি, ফাঁক আছে হাতখানেক। এই ফাঁকটুকু দিযে জ্যোতিষার্ণব নিজে আব তাব নিজেব লোক অন্দব থেকে গণনালযে যাতাযাত কবে।

বাইবের লোক আসে তিন নম্বব সদব দবজা দিযে। এসে ডবল চৌকীর ময়লা ফরাসেই হোক আব অযেলক্লথ মোড়া টেবিলেব সামনে কাঠেব চেযাবেই হোক, বসে। ব'সে চাবিদিকে তাকায, বিশ্বাস-অবিশ্বাস শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা আশা-নিবাশাব ভাবে বিব্রত চোখেব মত। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয, দেয়ালেব টিকটিকি পর্য্যন্ত। সস্তা মেযেমানুষ যেন সমস্ত পবপুরুষেব দৃষ্টি নিযে নিজেব সমালোচনা কবছে, আমাব কি উপায হবে ?

আসলে, এ ছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সব কিছুতে এই সমস্যাব ছাপ মাবা। ভবিষ্যৎ কি সব কিছুকে গ্রাস ক'বে নেই ?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনেব ফোঁটা দেবাব সময তাব ছেলেমেযেব মা মাথা কাত কবে, চোখ উল্টে দেয, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান কবে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপবাধ, সাতবছর আগে এই ভঙ্গি তাকে

ভুলিয়েছিল। তবে, কেবল ভঙ্গি নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, 'আমি মবলে তোমাব কি উপায় হবে ?'

জিজ্ঞাসা কবে সকালবেলা আব মবে যায সেই সন্ধ্যাব কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা কবেই যেন সে মবে গেল।

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপাব-খানা কি। তাব ছেলেমেয়েব মা মবণেব কথা বলবে মনে কবাব আগেই মাথাব উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটাব লেজ নডতে আবম্ভ করেছিল, তাব ছেলেমেয়েব মা মবণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আবেকটা টিকটিকিকে তাব ছেলেমেয়েব মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? আর সব তো তাব জানা আছে, যা কিছু মানুষেব জানা দবকাব। ওই জ্ঞানটুকু লাভ কবলেই কি তাব মনেব এ ধাঁধা মিটে যেত যে, তাব ছেলেমেয়েব মা মববে বলে টিকটিকিটা ডেকেছিল, অথবা টিকটিকিটা ডেকেছিল বলেই তাব ছেলেমেয়েব মা মবে গেছে ?

ছেলেমেয়েবা ছোট। বড ছেলেটি প্রথম ভাগেব বানান শেখে, ছোট ছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদেব মাঝখানেবটি মেয়ে, বোবা ব'লে সে কথা বলতে শেখেনি। মাব সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড ছেলেটি।

'মা কোথায় গেছে বাবা ?'

'স্বর্গে।'

ব'লে প্রমাণেব জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়ীতে আট-দশটাব কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবেব কথায সায দেয না। নিজেব ভুল বুঝতে পেবে নিজেকে বোকা মনে কবার লজ্জায করুণভাবে একটু হেসে জ্যোতিষার্ণব নিজে নিজেই কয়েকবাব মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়েব মা, এতদিনে সেখানে পৌঁছে

গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কি সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে একথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে টিকটিকি থাকতে পারবে না? তা ছাড়া, স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া তো জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে-স্বর্গে যায় ইহলোকে কি সে-স্বর্গ আছে? স্বর্গই নেই ইহলোকে!

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায়নি বলেও তো চুপ করে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল, সেটা অন্ততঃ একবার ডেকে উঠত। হোকনা অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? জ্যোতিষার্ণবের বিপদ এই সে জানে তার ছেলেমেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিতা বৌদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয় তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয়না? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশা ভরসা জ্যোতিষার্ণবের।

মার জন্য ছোট ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবা-কান্না কাঁদে। বড় ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেছে বাবা?'

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতিষার্ণব দেয়ালে টাঙ্গান যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েণ্টদের সবিনয়ে বলে, 'একটু বসুন, আসছি।'

ব'লে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর শিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সে দিন ঘরে যা কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা।

শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকেনা, কিন্তু টিকটিকি তো ফাঁকে ফোঁকরে জিনিসপত্রের আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, অতটুকু জীব টিকটিকি ? একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতির্ষার্ণব। ছেলেকে বলে, 'কি বলছিলি তুই খোকা ?'

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

'কখন বাবা ?'

'আপিসে ঢুকে কি বললি না আমাকে ?'

'কিছু বলিনি তো।'

ছোটবোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায়নি। তবে বয়সের তুলনায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতির্ষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, 'তোর মার কথা কি জিজ্ঞেস করলি না ?'

'মা কোথায় গেছে বাবা ?'

বোমা নিয়ে খেলা করবার মত অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতির্ষার্ণব বলে, 'নরকে।' ব'লে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোট ছেলেটার কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর হঠাৎ-গাওয়া দু'লাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি।

বড় ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধ হয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতির্ষার্ণব চোখ রাঙিয়ে বলে, কাঁদিস না।'

খোকা কাঁদেনা।

'শোন, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনও নরকে যায়নি, যাবে। বুঝলি ? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।'

আবার জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। বড় ছেলেটা কেঁদে ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোট ছেলেটার থেমে-আসা ছাড়া-ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসরের থেমে-আসা দুলাইন গানের দুর্ব্বোধ্য গুনগুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছিল, সেটার। দু'টি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার সখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতিষার্ণব তাই হাত দেখাতে, ঠিকুজী মেলাতে, ভাগ্য গণাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজা-পার্ব্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নির্ব্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে, শুধু দেখা করতে যে বন্ধুরা আসে তাদেরও তেমনি মনের কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মত মনের কথা বলার কথা-তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, এ পর্য্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বড় বিমর্ষ হয়ে যায়। গভীর আর্ত্ত বিষাদের ছাপ। তা ছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাসে বা চেয়ারে যেখানেই তার শ্রোতা বসে থাক, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশী। জ্যোতিষার্ণবের ভণ্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকেনা, অন্ততঃ তখনকার মত।

'প্রমাণ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত

বড় বড় প্রমাণ ঘটেছে। এই তো সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই দিন ওই সময় মারা যাবেন ?'

'জানতেন ?'

গণনালয়ের টিকিটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্ত-রেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি, স্থকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেযালপঞ্জী-বিজ্ঞাপন, দেয়ালে বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেযাল, ছাদ, কড়িবর্গার আড়াল, সমস্ত যাযগা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয়না, এদিক ওদিক একটু তাকালেই নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিযে থাকে টিকটিকিটার দিকে, তার পর মাথা হেলিযে বলে, 'প্রথমে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন তো, মন বিচলিত হযে পড়ে। সেদিন সকালবেলা হল কি, তামাসা করে আমায বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কি উপায় হবে ? মানে, সংসার তো এক রকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কি নে, তিনি যদি মরে যান এ সব কাজকর্ম্মই বা কে করবে, ছেলে-মেযে মানুষইবা কে করবে। যেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।'

'টিকটিকি ?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্ত-রেখা বিচার করে ওঁর বযস জিজ্ঞেস করলাম। বযস অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কুষ্টিটা বার করো তো, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কুষ্টি বার করে দিলেন। তখনও আমার মন বলছে, থাকগে কাজ নেই, মরণ যদি ওর ঘনিয়ে এসে থাকে, কি হবে আগে থেকে জেনে ? লাভ

তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনোকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনার ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেদিন গোধূলি বেলা পর্য্যন্ত ওঁর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিযে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—'

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিযে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওযা যায না।

'জানতাম কোন লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পবম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়েব সময তোমাব বযস তো দু'এক বছর কম করে বলা হয নি? কুষ্টি ঠিক আছে তো? বিয়েব সময় যদি—থাকগে ওসব কথা। আপনাকে যা বলছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—'

নযটি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম বেবতী। ছ'মাস পবে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেযেদের মানুষ করার জন্য বেবতীকে বিযে কবে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়ীতে আসে বটে, বাড়ীতে কিন্তু একটিও টিকটিকির দেখা সে পায না।

তবু, সাবধানেব মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বৌকে সতর্ক কবে দেয, 'ত্যাখো, কোনদিন মরার কথা মুখে এনো না।'

রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচাব কবে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিপদ দুজনের নক্ষত্র নিযে। তাব নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মত।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম, কি এ-ই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারিনি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোট। কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়ী, কি ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়েসের তুলনায় কি প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন,—কারো স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশী কড়ি আর তাস খেলতাম যে ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামী কি যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীর সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতিষার্ণব দু'বার ঘুরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

'দেখি হে ছোকরা তোমার হাতটা। আরে বাস রে, একি হাত, এত হিজি-বিজি রেখা পেলে কোথায়? ভাল করে দেখতে হবে তো হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেকদিন, তবে—'

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

'খুব হয়েছে, ছেলে মানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।'

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতিষার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপগুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধা তৃষ্ণার

তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারীর পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষার্ণবের গল্প শেষ হতে বলি 'আরেকটা।'

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতিষার্ণব হাসির ভান করে বলে, 'এ বাড়ীর টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তা হলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘরেই তো তিনটে আছে, লাঠিটা দিযে মার না একটা ?'

আমি বলি, 'লাঠি দিযে বুঝি টিকটিকি মারে ? দাঁড়ান, আমার তীর ধনুক নিয়ে আসি।'

রেবতী বলে, 'মাণিক, মেরো না, টিকটিকি মারতে নেই।'

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে, রেবতীর মত মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালবেসেছে, কথা না শুনলেও ভাল না বেসে সে পারবে না,আমাব সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলবার জন্য সে যে রকম পাগল হযে উঠেছে, সে পাগলামি যাবার নয়। গল্প না বলে আমায কষ্ট দেবাব সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতলায গিযে আমার বাঁশের ধনুক, আর শবেব তীব নিয়ে আসি। তীর আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায দুটি আলপিন বসান আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাসে উঠে দাঁড়ালে আমার তীরের আয়ত্তে আসে এইরকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিষ্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মাবা হয়।

রেবতী আবার বলে, 'মাণিক, মেরোনা, মারতে নেই।'

রেবতীকে আমি ত্যাগ করিনি, কিন্তু তার কথার কোন দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান করে চার ইঞ্চি তফাৎ থেকে বাণ নিক্ষেপ

করি। এমন আশ্চর্য্য জীব টিকটিকি যে শিকারীকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নীচে পড়ে যায়। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি, ছুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে ছুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন ছুটি চোখ। মানুষের রক্তের মত লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

'চার-চোখো করে দিলে! টিকটিকিকে চারচোখো করে দিলে! তোমাকেও চারচোখো হতে হবে মাণিক।'

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! ছেলেমেয়ের বাপ-মা হবার জন্য তারা যদি পরস্পরকে কোনদিন ডাকাডাকি করে থাকে, সে খবর কেবল তারাই জানে।

রেবতী নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, 'ফের? ফের ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?' ব'লে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চারচোখো বলে কত যে তামাসা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়ীতে আমি কোন দিন যাই নি। চারচোখে রেবতীকে একবার চোখেও দেখি নি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার ছুটি ধূসর চোখ, তার চোখ ছুটির পাশে ছুটি ফ্যাকাসে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায়

আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,—রেবতীর কোন দোষ ছিল না, তবু।

হয়ত' রেবতী জ্যোতিষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়ত' টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

বিপত্নীক

কার্তিকের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। ঘুম ভেঙে আমি প্রকাণ্ড একটা হাই তুললাম। কাল রাত্রে গাঢ় ঘুম হয়েছে। চোখ মেলে ঘরের শিলিং-এ কালো কড়িকাঠটার পাশে একটা টিকটিকিকে আবিষ্কার করে খানিকক্ষণ অলস অর্থহীন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আজ রবিবার, উঠবার তাড়া নেই। আর ঘুমানো যাবে না বটে, কিন্তু চুপচাপ আরও ঘণ্টাখানেক বিছানায় পড়ে থাকার কল্পনাতেই প্রচুর তৃপ্তি বোধ করলাম।

বিছানার ডানদিকেব অংশটা খালি। সবিতা সকালে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে যায়, আমি কোনদিনই প্রায় তা জানতে পারি না। আমার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সবিতার বাসন মাজা শেষ হয়ে রান্না চেপে যায়। অত ভোরে কি করে যে মানুষ ওঠে! ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে থাকার আরামটুকু থেকে প্রত্যেকদিন নিজেকে বঞ্চিত করেও সবিতাকে বেশ খুসীই দেখতে পাই। মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে চা জলখাবার এনে দিয়ে সে যে কথাটি বলে, তাতে বোঝা যায়, রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার পর এক মিনিট চিৎ হয়ে জেগে পড়ে থাকার মত কষ্টকর ব্যাপার, সবিতার মতে, জগতে আর নেই।

ডানহাতটি আলস্য ভাঙার ভঙ্গিতে বিছানার শূন্য অংশে প্রসারিত করে দিলাম। সবিতার অঙ্গের উত্তাপ উপে গিয়ে বিছানা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে সবিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম।

এতক্ষণ এ কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ামাত্র রৌদ্রহীন শীতল প্রভাতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী গাঢ় নিদ্রার জের টেনে চলার আনন্দ এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। আরামে এলানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের অজ্ঞাতেই গুটিয়ে সঙ্কুচিত করে নিলাম।

কি কটু কলহই কাল আমরা করেছিলাম!

আমরা করেছিলাম? কথাটা বিবেচনা করে দেখবার সময় না নিয়ে খুব সংক্ষেপেই নিজেকে জবাব দিলাম,—না। ঝগড়া বলি, কলহ বলি, কাল আমি একাই সব করেছিলাম। মাঝে মাঝে ক্ষীণ করুণ প্রতিবাদ করে কাঁদা ছাড়া সবিতা তাতে আর কোন অংশ গ্রহণ করে নি। কাল আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছিল, চাপড়া চাপড়া রঙ চড়িয়েও তাকে দাম্পত্য কলহ কোনমতেই বলা যায় না।

সবিতাকে কাল আমি করেছিলাম শাসন।

মনের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে অত্যন্ত হিংস্রভাবেই ওকে কাল আক্রমণ করেছিলাম। যা' মুখে এসেছে অবাধে কাল তাই সবিতাকে বলেছিলাম। যে বিশেষণ যত বেশী রূঢ় যত বেশী কদর্য্য মনে হয়েছে তাই দিয়ে ওকে অভিহিত করে কাল আমার আনন্দ হয়েছে তত বেশী। মেয়েদের একেবারে মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করে মানুষের ভাষায় এমন শব্দ যত আছে তার একটিও কাল বোধ হয় ব্যবহার করতে বাকী রাখিনি। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে পায়ের এক পাটি চটি জুতো ওকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

সেইখানেই ইতি। দু'হাতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সবিতা তখন কাঁদছিল। চটিটা সজোরে তার কান্নায় ফুলে ওঠা বুকে গিয়ে লাগল।

চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে সবিতা তখন একবার জুতোটার দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দুচোখ তার জলে ভরপূর, সবিতা কি দেখেছিল বলতে পারব না। কিন্তু তার মুখের যে ভাব দেখেছিলাম এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তবু, রাত্রে গাঢ় ঘুম হতে বাধা হয় নি। সবিতাকে শাসন করবার জন্য না হোক, জুতা খেয়ে তার অবর্ণনীয় মুখভঙ্গি দেখার জন্যও না হোক, যে কারণে কাল ওরকম ক্ষেপে গিয়ে স্ত্রীকে শাসন করেছিলাম সারারাত কণ্টকশয্যায় তাকে জাগিয়ে রাখার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট ছিল না? এই মাত্র মনের মধ্যে যে নিবিড় শান্তি অনুভব করছিলাম তা স্মরণ করে অবাক হয়ে গেলাম। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে যে স্বামী রাত্রে স্ত্রীকে চটিজুতো ছুঁড়ে মারে, সারারাত অঘোরে ঘুমিয়ে সকালে চোখ মেলেই কি করে সে অত আরাম বোধ করে? পৃথিবীতে শীতের আমেজ এসেছে টের পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে?

ঘুম ভেঙেই আমার অনুতপ্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কাল বাড়াবাড়ি করেছিলাম বৈকি। নিছক একটা সন্দেহের উপর অত কাণ্ড করার কোন সমর্থনই শান্ত মনে কথাটা ভেবে দেখতে গেলে খুঁজে বার করা যায় না। স্ত্রীকে অবশ্য মাঝে মাঝে শাসন করা ভাল। বড় পাজী জাত। কেবল আদর দিলে একেবারে মাথায় উঠে যায়। কিন্তু শাসনের যে একটা মাত্রা থাকা দরকার, এটা অস্বীকার করব কেন? সবিতাকে তো কম ভালবাসি না। এই যে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি আপিসে কলম পিষে মরি, সে কার জন্য? সবিতার জন্য নয় কি! ওর ভালর জন্যই ওকে মাঝে মাঝে শাসন করা প্রয়োজন। কাল কিছু না বলে চুপ করে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত ওরই তো ক্ষতি হ'ত!

নিজের ভাল মন্দ মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না। বিশেষতঃ মেয়েমানুষ। ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, ভুল সংশোধনের জন্য একটু বকলে তাতে ওদের মঙ্গলই হয়।

কিন্তু অতটা না করলেই হ'ত। অন্ততঃ ঘুমিয়ে পড়ার আগে সহজভাবে ওর কাছে একগ্লাস জলটল চেয়ে নিয়ে অথবা পা কামড়াচ্ছে বলে দুচার মিনিট ওকে একটু সেবা করতে দিয়ে ব্যাপারটা স্বাভাবিকতার স্তরে নামিয়ে আনলে কোন ক্ষতিই ছিল না।

পাশ ফিরলাম। তাকিয়ে দেখি, সবিতাকে ছুঁড়ে মারা জুতোর পাটিটা কাল রাত্রে যেখানে পড়েছিল, সেইখানেই এখনো পড়ে আছে। মনে হ'ল, এতক্ষণ আমার যেন সত্যসত্যই একটু অনুতাপ হচ্ছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুঁজে নিতেও দেরী হ'লনা। যা' হবার হয়ে গিয়েছে। হাত থেকে খসে যাওয়া ঢিল আর মুখ থেকে খসে যাওয়া কথার মত আর ফিরবে না। দুঃখ বা অনুতাপ করে লাভ নেই। শুয়ে শুয়ে আরাম করাটা আজ আর কপালে হল না। উঠে গিয়ে সবিতাকে একটু খুসী করতে হবে।

সবিতাকে একটু খুসী করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করব শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলাম। ক্ষমাটমা চাইতে পারব না। স্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ, মার্জ্জনা ভিক্ষা,—এসব আমার ধাতে নেই। ভাবলেও কি রকম সঙ্কোচ. বোধ হয়, বাধ' বাধ' ঠেকে। কাল রাত্রের কথাটা উত্থাপনই করব না। কাল যেন সবিতাকে কিছু বলিনি এমনি একটা অভিনয় করে যাব। প্রতিদিন যেমন চটি ফটর ফটর করে নীচে নামি আজও তেমনি শব্দ করে নীচে নামব, কলতলায় গলা খাঁকরে মুখ ধোব। সাড়া পেয়ে উনান থেকে হাঁড়ি নামিয়ে সবিতা চায়ের কেটলি চাপিয়ে দেবে কিন্তু মুখ ধুয়ে আজ আর দোতলায় উঠে যাব না। একবারে রান্নাঘরে

হাজির হয়ে নিজেই একটা আসন টেনে নিয়ে বসব। গম্ভীর মুখে নয় মুখখানা বেশ হাসি হাসি করে। সবিতা বিষণ্ণতা ও অভিমানে নিজেকে আচ্ছন্ন ও নির্ব্বাক করে সামনে খাবার দিলে খেতে খেতে একথা বলব, সেকথা বলব। সবিতা ভাল করে জবাব না দিলেও কিছুই যেন লক্ষ্য করিনি এমনিভাবে নিজের কথার স্রোতকে অব্যাহত রেখে যাব।

সবিতা প্রথমটা নিশ্চয় একটু অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, ব্যাপারখানা কি? কাল রাতে আমাকে অমন করে যে গাল দিলে, সে সেধে এসে এত কথা কইছে! তারপর একসময় সে বুঝতে পারবে তার গভীর অপরাধ স্বামী তার এবারের মত ক্ষমা করেছে। কাল রাত্রের ব্যাপার কাল রাত্রেই চুকে গিয়েছে—আজ সকালে তার জের নেই। এটা বুঝতে পেরে সবিতাও ক্রমে ক্রমে সহজভাবে কথা বলতে আরম্ভ করবে। রাগ করে থাকার যার উপায় নেই, রাত্রের শাসন সকালে উঠে নতুন করে আরম্ভ করলেও যার বলার কিছু ছিলনা, নিজে থেকে তাকে যেচে সহজভাবে কথা বলা সহজভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি জন্মে যাবে! ভাববে, স্বামী আমার সদাশিব। যে অন্যায় করছিলাম বা করতে যাচ্ছিলাম, অন্য স্বামী হলে আমাকে একেবারে মেরেই ফেলত। আমার স্বামী একটু শাসন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকালে উঠে এমনি করে আমার মান রাখল, আমার অভিনয়ের মর্য্যাদা দিল।

মুখে হয়ত সবিতা কিছুই বলবে না। মেয়ে তো চাপা নয় কম! কিন্তু কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছল ছল করবে। স্বামী-প্রেমে স্বামী-গর্ব্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। স্বস্তি ও আনন্দ তার গৃহকর্ম্মের সুচারু সম্পাদনায় স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে।

উঠে বসলাম। অনুতাপ মিলিয়ে গিয়ে মন এখন খুসী হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে সবিতাকে তার প্রাপ্যের যতটুকু অতিরিক্ত শাসন

করেছি, আজ তার তিনগুণ সোহাগ ফিরিয়ে দেব। যে সোহাগ করে, শাসনও তো সে-ই করে! একটি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অন্যটি বেশী মাত্রায় দিলে ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু লাভ থাকতে কোন বাধা নেই। সবিতার আজ লাভের কপাল।

একপাটি চটি পায়ে দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গিয়ে সবিতাকে ছুঁড়ে মারা চটিটা অন্য পায়ে লাগালাম। বাঁয়ে সবিতার ড্রেসিং টেবল্। আয়নাটা কুয়াশায় ম্লান হয়ে আছে। সবিতার এই বিলাসিতার ব্যবস্থা করেছি আমি। সবিতার বাপ যৌতুক দেয়নি। বাপের জন্মে সবিতা ড্রেসিং টেবল্ দেখেছে কিনা সন্দেহ। ডাইনের আলনায় সবিতার রঙ-বেরঙের কাপড় সাজানো। কুয়াসায় কাপড়গুলির ভাল রঙ্ খোলেনি। এসবও আমি কিনে দিয়েছি সবিতাকে, সবিতাকে ভালবেসে কিনে দিয়েছি। সামনে বেঞ্চির উপর সবিতার বাক্স, ক্যাসবাক্স, সুটকেশ, হারমোনিয়ম। কুয়াসায় সবিতার এই সম্পত্তিগুলিকে কেমন যেন মন-মরা দেখাচ্ছে। সবিতার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করা টাকায় এগুলি কেনা। চারিদিকে সবিতার প্রতি আমার উদারতার সংখ্যাতীত প্রমাণ দেখে, সবিতাকে যে অনন্য-সাধারণ ভালবাসা দিয়েছি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে, আমি আরও গভীর তৃপ্তি বোধ করলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কাল রাত্রে ধৈর্য্য হারিয়েছিলাম কেন। সবিতাকে ভালবাসি বলে। সবিতার প্রতি প্রেম আমার এত তীব্র যে ঈর্ষাও সেই অনুপাতেই প্রচণ্ড হয়। একটা মিথ্যা সন্দেহ পর্য্যন্ত তাই আমাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে দেয়।

সবিতা ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। দরজাটি খোলে, ঘেরা বারান্দায়। সেও একটি লম্বাটে ঘরেরই মত। রাত্রে এই বারান্দায় দরজা বন্ধ করা হয়, কিন্তু ঘরের দরজাটি খোলাই থাকে। বন্ধ করার দরকার হয় না। সকালে বারান্দায় রাত্রি ভোজনের এঁটো বাসন তুলে ধোয়া

মোছার শব্দে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে সবিতা দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

সবিতার ড্রেসিং-টেব্‌লের আয়নায় খানিকক্ষণ নিজের মুখখানা নিরীক্ষণ করে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় গেলাম। প্রথমে চোখে পড়ল এঁটো বাসনগুলি তারপর সিঁড়ির বন্ধ দরজাটা—তারপর দোদুল্যমানা সবিতাকে।

উঠানের দিকের দুটো বড় বড় খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছিল। এক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে।

পাশের বসবার ঘর থেকে হাল্কা টেবিলটা এনে তার উপরে চেয়ার পেতেও সে বোধ হয় কড়ি কাঠের নাগাল পায়নি। তাই টেবিল চেয়ার একপাশে সরিয়ে রেখেছে। ছেলে হলে যে হুক থেকে সবিতার ছেলের দোলনা দুলত, দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সবিতা তাতে দড়ি আটকেছে বোধ হয়। কিন্তু এ কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় দরকার হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে চাওয়ার উন্মত্ততা ছাড়া, ছুঁড়ে ছুঁড়েই সে যে কড়িকাঠে দড়ি আটকেছিল, তারও কোন প্রমাণ নেই। হয়ত অন্য কোন উপায়ে এই কাজকে সে সম্ভব করেছিল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে মানুষের ঘুমের আড়ালে যে মরতে যায়, বুদ্ধি হয়ত তার এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার এমন উপায়ই হয়ত সে আবিষ্কার করে ফেলে যে প্রত্যেকটি সকালে যারা ঘুম ভেঙে জীবিত অবস্থায় বিছানায় উঠে বসার আশা পোষণ করে, তারা সেই বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার করার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না।

গলায় ফাঁসিটা পরাবার আগে কাল সবিতা কি করেছিল জীবনে কখনো আমি তা জানতে পারব না ভাবতেও পারব না।

এই সমস্যাই যেন আমাকে বিচলিত করে দিল। সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে এটা বুঝতে আমার দেরীও হয়নি, অসুবিধাও হয়নি। কিন্তু

কড়িকাঠের অত উঁচু হুকে সে দড়ি আটকাল, কি করে এটা বুঝতে না পেরে কাতর হয়ে পড়লাম। অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে বলে যেন নয়, গলায় দড়ি দেবার ঠিক আগের কাজটিকে সে দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় করে রেখে গেছে বলেই আমার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠল। সবিতা কি করে কড়িকাঠে তার মৃত্যুর আয়োজন করল এ কথাটা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে ?

আত্মহত্যা করে সবিতা আমাকে সবই বুঝিয়ে দিযে গেল, এই একটা তুচ্ছ গোপনতার মোহ সে কাটাতে পারল না কেন ?

সবিতাকে আমি সবদিক দিয়েই চিনেছিলাম। সে কি খেতে ভালবাসে, কোন্ গয়না কি রঙের শাড়ী তার পছন্দ, কি কথা বললে সে খুসী হয়, কোন্ বিষয়ে মনের সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিযে সে সুখ পায, জীবনের কোন্ স্তরে সে অনায়াসে উদার হয়ে থাকে, এ সবই আমার জানা ছিল। সংসারে কার প্রতি তার কতটুকু মমতা আমি তার হিসাব রাখতাম। অলস কল্পনার মুহূর্ত্তগুলি ছাড়া ওর স্বামীপ্রেমের গভীরতাও আমি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পেরেছি। সবিতা ছিল আমার অতি জানা অতি চেনা বৌ।

কাল ওর সম্বন্ধে যে বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না কিন্তু সন্দেহ ছিল, আজ সবিতা আত্মহত্যা করে সে বিষযেও আমাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দিয়েছে। সন্দেহ আমার মিথ্যা নয় এই সত্য প্রকাশ করে যেতে গলায সবিতা দড়ি দিয়েছে বলে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু দড়িটা হুকে সে আটকাল কি করে ?

ছায়া

আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুদিন আমি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। সময় মত স্নানাহার করতাম না, ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে আসতাম না, দিনরাত পরলোকতত্ত্বের বই পড়তাম আর চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবতাম।

স্ত্রীকে আমি এত ভালবাসতাম যে, শ্মশানে নিজে মুখাগ্নি করে তাকে পুড়িয়ে এসেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না, সে সত্যসত্যই বাষ্প আব ভস্মে পরিণত হয়ে গেছে, জগতের কোথাও সে আর নেই। আমার মনে হত, সে ফিরে আসবে ; আবার আমি তার দেখা পাব।

বাড়ীতে বেশী লোক থাকলে আসতে সে পাছে কুণ্ঠা বোধ করে এইজন্য আত্মীয়-স্বজন সকলকে আমি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পার্থিব কোন সুখ-সুবিধার দিকে আমার নজর ছিল না। একটা ঝি আর একটা ঠাকুর রেখে দিয়েছিলাম, তারা যা ব্যবস্থা করত আমি তাই মেনে নিতাম। কোন বিষয়ে তারা হুকুম নিতে এলেই বরং আমি এমন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম যে তারা সভয়ে আমাকে পরিহার করে চলত। একটা ঘরে আমার স্ত্রীর পাঁচখানা ছোট-বড় — ফটো, তার জামা-কাপড়, চুল বাঁধার সরঞ্জাম, পায়ের জরি-বসানো চটি, হিসাব লেখার খাতা, এমনি সব হাজার রকম স্মৃতিচিহ্ন জড়ো করে' দিনের বেলাটা আমি সেই ঘরে কাটিয়ে দিতাম। সন্ধ্যার সময় যেতাম আমার স্ত্রী যে-ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরে। যে-খাটে তিনি শেষ

নিশ্বাস ফেলেছিলেন, নিজের হাতে আমি তাতে বিছানা পেতে নিতাম। পাশাপাশি বালিশ দিতাম দুটি। শুয়ে, বসে বই পড়ে আর থেকে থেকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে রাতগুলি আমি একরকম জেগেই কাটিয়ে দিতাম।

এমনিভাবে মাসখানেক কাটিয়ে পলকের জন্যও আমার স্ত্রীর দেখা না পেয়ে আমি যখন অল্প অল্প হতাশ হয়ে উঠেছি, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর আমার খেয়াল হল যে, রোজ এ-ঘরে আলো জ্বেলে রাখি বলে তিনি হয়ত আসেন না। খেয়াল করামাত্র তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আমি আলো নিবিয়ে দিলাম।

আনন্দে আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল।

আলো নেবানমাত্র আমি দেখতে পেলাম ছায়ার রূপ নিয়ে আমার স্ত্রী দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে আছেন, তাঁর সূক্ষ্ম দেহ থেকে জ্যোতি নির্গত হয়ে তার চারিদিকে ফটোর ফ্রেমের মত চতুষ্কোণ খানিকটা স্থান উজ্জ্বল হয়ে আছে। তেমনি এলো খোঁপা, কপালের কাছে তেমনি পাটকরা চুলের ঈষৎ উচ্চতা, তেমনি টিকলো নাক ও সুডোল চিবুক। গলদেশ বেষ্টন করা, খসে-পড়া ঘোম্‌টাটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে।

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে দেখতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুহাত উঁচু করে আমার অতি-চেনা ভঙ্গিতে হাই তুললেন। এবার তার সমস্ত অবয়বের ছায়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে হাত-দুই পাশের দিকে সরে তিনি ঘরের আবছা অন্ধকারে মিশে গেলেন। কেবল তার চারিদিকে যে চতুষ্কোণ ফ্রেমের মত যে উজ্জ্বলতা ছিল তা রয়ে গেল অবিকৃত! টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়লাম ঘুমিয়ে। আমার অসুস্থ দেহ মন তার এই অপূর্ব্ব আবির্ভাবের উত্তেজনা সহ্য করতে পারল না।

সেই দিন থেকে রোজই তাকে দেখতাম।

সন্ধ্যা হবার আগেই আমি ঘরে গিয়ে বসে থাকতাম। যখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসত, হঠাৎ ঠিক সেই সময় দেয়ালের গায়ে সেইখানে উজ্জ্বল চতুষ্কোণ পটভূমিকাটির আবির্ভাব হত। কোনদিন তিনি এসে প্রথম দিনের মত দেয়াল ঘেঁষে বসতেন, কোনদিন চঞ্চলভাবে আনাগোনা করতেন, কোনদিন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আল্‌গা খোঁপা বেঁধে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে তার বেঁচে থাকার সময়কার আমার সবচেয়ে প্রিয় লীলাভঙ্গিটির অভিনয় করতেন। কোনদিন হাত নেড়ে মুখ নেড়ে আমার সঙ্গে কথা বলার অভিনয়ও করতেন, কিন্তু শব্দ হত না।

শব্দ তিনি কোথায় পাবেন?

আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলার অথবা কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করতাম না। ছায়ার সঙ্গে যে কথা বলা যায় না, ছায়াকে যে ছোঁয়া যায় না, এটুকু জ্ঞান আমার ছিল। আমি শুধু তাঁকে দেখতাম। তাতেই আমার বিরহ-বেদনা লঘু হয়ে যেত। কেবল, তিনি যখন ঝাপ্সা বিকৃত মূর্ত্তিতে দেখা দিতেন, আমার বড় কষ্ট হত। আমি বুঝতে পারতাম শুধু রূপ পরিগ্রহ করার চেষ্টা করেও তিনি পারছেন না, কে জানে তার কত যাতনা হচ্ছে!

একদিন আমাদের এক অদ্ভুত মিলন হয়েছিল। সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে আমি তা অতিক্রম করে গিয়েছিলাম। সেদিন আমি একটি ইংরাজী পরলোকতত্ত্বের বই-এ জীবন্ত প্রাণীর সূক্ষ্ম দেহ ধারণের কতকগুলি বিবরণ পাঠ করেছিলাম। রাত্রে তিনি তাঁর আলোকপটে এসে দাঁড়ানমাত্র আমি দেখতে পেলাম, আমার ছায়ারূপ পিছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পরলোকগতা পত্নীর সঙ্গে আমার অনন্ত ব্যবধান ভুলে গেলাম।

আমার নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁর শিথিল অচল দেহ আগের মত জীবনের আবেগে উষ্ণ ও স্পন্দিত হয়ে উঠল। তাঁর রক্ত-মাংসের দেহই যে আমার বক্ষে লগ্ন হয়ে আছে, আমার তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। আমি তাঁর চুলের স্পর্শ পেলাম, ত্বকের স্পর্শ পেলাম, তাঁর উষ্ণ নিশ্বাস আমার গালে লাগল। তার দেহের ভার পর্য্যন্ত আমি অনুভব করলাম।

ছায়া কি ভারি হয়?

তারপর সেদিন কি যে হয়েছিল আমার মনে নেই। স্ত্রীর ছায়াময়ী মূর্ত্তি আমার অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু তাঁর রক্ত-মাংসের স্পর্শায়ত্ত বাস্তব মূর্ত্তি আমায় মূর্চ্ছিত করে দিল।

আত্মহত্যা করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার কল্পনা তাঁর মৃত্যুর দিন থেকেই আমার মনে ছিল, এই ব্যাপারের পব আর একটা দিনও পৃথিবীতে থাকতে আমার ইচ্ছা হল না। পরদিন দু'ভরি আফিম কিনে রাখলাম। ঠিক করলাম, রাত্রে স্ত্রীর আবির্ভাব হলে দরজা বন্ধ করে তাঁর সামনেই আফিম খেয়ে শুয়ে থাকব। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমাদের জীবন ও মৃত্যু এই দুই স্তরের অন্তর্গত অস্তিত্বের ব্যবধান ঘুচে যাবে।

তাঁর ছায়ারূপকে সেদিন আমার যেন আরও স্পষ্ট আরও নিখুঁত মনে হল। আত্মহত্যা করতে আমার যে একটু একটু ভয় ছিল, তাকে দেখার পর সেটুকুও মিলিয়ে গেল। উঠে গিয়ে আমি দরজা বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুধু স্ত্রীর ছায়া নয়, তার আলোর আবেষ্টনী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার সঙ্গে তার এই উজ্জ্বল পটভূমিকে আমি কখনো অদৃশ্য হতে দেখিনি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার দরজা খুললাম। দেয়ালের গায়ে আলো এবং আমার স্ত্রীর ছায়া দুই-ই আবার রূপ নিল। তখন তাকিয়ে দেখে টের পেলাম, আমার ঘরের দরজার বাইরে বাড়ীর ঝি

বসে আছে, ঠিক যেন কার প্রতীক্ষায়। নীচে নামার সিঁড়ির বাঁকের কাছে দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলছে তার আলো দরজা দিয়ে সোজা আমার ঘরে ঢুকেছে।

শুনতে পাই তারপর বছর-খানেক আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বর্ত্তমানে আমার কিছুমাত্র পাগলামি নেই এবং আমি আবার বিয়ে করেছি।

অথচ, আশ্চর্য্য এই এখনও আমি পরলোকে বিশ্বাস করি!

হাত

কাঠ যদি শুষ্কতার প্রতীক হয়, কাঠির প্রতীক হওয়া উচিত রোগা শুষ্কতার। কাঠ চিরলেই হয় কাঠি, মানুষকে রোগা হওয়ার জন্য ভুগতে হয় কিন্তু রোগে। এদিকে আবার মোটা হবার রোগও জগতে আছে। রোগা হবার ব্যাপারটা তাই বড় জটিল, প্রায় দর্শনের সমস্যার মত। মহামায়া যে কাঠির মত সরু, সময় সময় সেটা এমন খারাপ দেখায় যে, স্পষ্ট মনে হয় মেয়েমানুষের শরীরে এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মহামায়াকে সব চেয়ে খারাপ দেখায় সে যখন দাঁড়ানো অবস্থাতেই উপুড় হয়ে মেঝেতে কোন হাতের কাজ সারে। বড় মাছ পড়লে ছিপও এই রকম ভঙ্গি করেই বেঁকে যায়।

মহামায়ার হাত দুটি বড় লম্বা। রোগা না হলে তাকে বেঁটে বলা যেত, গড়নের আর একটু অভাব থাকলে তাকে ছেলে বলা যেত, হাত দুটি তার ইঞ্চি কয়েক ছোট আর একটু কম সুগোল ও সুপরিপুষ্ট হলে বলা যেত মানিয়েছে। বাড়ীর মানুষগুলির মধ্যে সে নিজে যেমন বেমানান, তার প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে হাত দুটিও তেমনি বেমানান। যেন ধার-করা জিনিস।

ধার-করা জিনিসের মতই হাত দুটি কিন্তু তার কাজের। কত কাজ যে সে করে সীমা নেই। সেলাই-এর কাজ, বোনার কাজ, লেখার কাজ, সংসারের কাজ, সেবার কাজ। হাতে কাজ না থাকলে সে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারে না, ঘুম ভাঙার পর থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়া পর্য্যন্ত হাত

তার অবিরাম কাজ করে যায়। হাতের পরিশ্রমের শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে আসে, কোমর টন টন করে, মনে হয় হাঁটু মুচড়ে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে যাবে, কিন্তু হাত তখন তার বোধ হয় ডাম্বেল ভাঁজতেও রাজী। জোর করে কাজ থেকে বঞ্চিত করে রাখলে হাত তার এটা ঘাঁটে, ওটা ঘাঁটে, একে টানে, ওকে ঠেলে দেয়—ঠিক নিষ্কর্মা মানুষের মত ছটফট করতে আরম্ভ করে। তারপর এক সময় দেখা যায় একটা অকাজকে কাজে পরিণত করে হাত তার ভারি ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে।

স্বামীর গদি-আঁটা চিৎ হবার চেয়ারে চিৎ হযে ছোট মেয়েকে মাই দিতে দিতে মেজ-জা কেতকী বলে, 'চারা-গাছটা টব থেকে ওপড়ানো হল কেন ?'

মহামাযার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ফুলের চারার চেয়ে সে নিজের হাতের দিকে তাকায বেশী করে। তাই তো, তার হাত দু'টিকে তো বিশ্বাস নেই! এই তো হেঁসেল তুলে এসেছে আরও হাজারটা টুকিটাকি কাজ সেরে, এর মধ্যে এত কি অধীর হযে উঠল তার হাত যে দ্যাওরের টুথ ব্রাশ দিযে খুড়ে খুড়ে টব থেকে আস্ত একটা ফুলের গাছ উপড়ে ফেলল ?

ছুঁচোলো চিবুকের চামড়া কুঁচকে, রেখার মত পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে সে একটু হাসে, বলে, 'ভাল করে পুতব বলে উপড়েছি ভাই। রোজ জল দিচ্ছি, ফুল ফুটবার নাম নেই, তাই ভাবলাম একবার তুলে আবার পুতি, দোষটোষ কিছু থাকে তো শুধরে যাবে।'

লাগসই কৈফিয়ৎ দিলে কি হবে, মনটা মহামায়ার খারাপ হয়ে যায়। লাগসই দূরে থাক কোনরকম কৈফিয়তই দিতে পারে নি, এমন অকাজও কি সে করে নি ? সকালে সেজ দ্যাওরের ছেলেকে চারবার লোফালুফি করে খেয়াল হয়েছিল সেটা মানুষের বাচ্চা, কুমড়ো কাঁকুড় নয়। তার

খানিক পরে ছোট ননদের সাতাশ টাকার শাড়ীখানা ছিঁড়ে দোফালা করে ফেলেছিল, এখনকার মত এমনিভাবে রোদে-মেলা শাড়ীর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে। কেন এমন হয়? কোন কথা ভাবতে গেলেই নিজের হাতের কথা কেন সে ভুলে যায়? কেন তার মনে থাকে না যে, সে একটু অন্যমনস্ক হলেই হাত দুটি তার চুপি চুপি এমন একটা কিছু কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে, যার জন্য নিজের তার বিপদের সীমা থাকবে না?

মন খারাপ করে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমক লাগে মহামায়ার। এইটুকু ভাবনার অবসরেই ডান হাতটি এক কাজ করে বসে আছে। উঠানের ওদিকে উঁচু প্রাচীর, তারও ওদিকের বাড়ীটার তেতলার জানালায় দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা ইসারায় আসবার অনুমতি প্রার্থনা করছিল, এই নিঝুম দুপুরে তাকে তার ডান হাতটি ডেকে বসেছে।

নিঝুম দুপুর হয়তো নয়, একতলার প্রেসে হয়তো এখনি ঘটাং ঘটাং ছাপার কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে, তবু অন্তত দুপুর তো,—এসময় এভাবে ইসারার আদান-প্রদান চোখে পড়লে লোকে ভাববে কি? লোকে তো জানবে না ও বাড়ীর বাবীণের কাসি হয়ে গলা ভেঙে গেছে বলেই নিজের বুকে হাত ঠুকে জিজ্ঞাসা করেছে, এখন রুমাল নিতে আসবে কিনা, আর সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলেই তার অবাধ্য হাত হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকেছে। গলা অবশ্য তার ভাঙে নি, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে সে চ্যাচাবে কি করে? হাতছানি দিয়ে না ডাকলে হত। ওর ইসারা আর তার হাতছানি যে দেখেছে, সে যখন ওকে এসময় এবাড়ীতে ঢুকতে দেখবে, ভাবতে আর সে কিছু বাকী রাখবে না।

ভাল করে পুতবার জন্য ওপড়ানো-চারাটি ইতিমধ্যে কয়েক টুকরায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে মহামায়া আড়চোখে একবার কেতকীর দিকে তাকাল। কেতকী চোখ বুজেছে। দুপুরবেলা স্বামীর

ছেলেকে বুকে নিয়ে স্বামীর চিৎ হবার চেয়ারে চিৎ হয়ে বেশীক্ষণ কেতকী চোখ খুলে রাখতে পারে না।

ভাঙা চারাগাছটা নীচে ফেলে দিয়ে মহামায়া দু'হাতে রেলিঙটা শক্ত করে চেপে ধরল। এই কাজটাই করুক হাত দুটি, এই রেলিঙ-ধরার কাজ। এত জোরে ধরুক রেলিঙ, যেন খুলবার সময় রীতিমত একটু কষ্ট হয় হাত দুটির, প্রত্যেকটা আঙ্গুল সোজা করবার সময় যেন বুঝতে পারে এ এক ধরণের শাস্তি।

সেইখানে দাঁড়িয়ে মহামায়া বারীণকে বাড়ী ঢুকতে দেখল, একতলায় প্রেসে কেতকীর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে শুনল, দোতলা ডিঙিয়ে জুতোর শব্দে তেতলায় সপুত্র কেতকীর ঘুম ভাঙিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখল, তবু রেলিঙের মুঠি খুলল না। আঙুলের গাঁটগুলি তখন তার ধবধবে সাদা হয়ে গেছে, রক্তের স্রোতের সঙ্গে একটা স্তিমিত ব্যথা দেহের ভিতরের দিকে বয়ে চলেছে।

'রুমালগুলো হয়েছে বৌদি ?'

বারীণের কথায় একটা শব যেন বেঁচে উঠল। এক মুহূর্তে মহামায়ার দেহের অসাড়তম অঙ্গটুকুতে পর্য্যন্ত যেন এল প্রাণস্পন্দনের জোয়ার। তাড়াতাড়ি রেলিঙের বাঁধন থেকে হাত ছাড়িয়ে সে বলল, 'সব হয় নি, কটা বাকী আছে। একটু বসুন, এখুনি সেলাই করে দিচ্ছি,—পাঁচ মিনিট।'

কাজের যে কোন অভাব আছে তা নয়, বাড়ীতে লোক তের জন, প্রেসের দু'জন কম্পোজিটারও বাড়ীতেই থাকে। আপিসের তাড়া নেই বটে, স্কুল কলেজের তাড়া আছে। তবে মহামায়ার মুস্কিল এই, সকলে তাকে সব কাজ করতে দেয় না। স্বামী আর ছেলেমেয়ের এমন কতগুলি

সেবা আছে, যা খুব বেশীরকম আলসে স্ত্রী আর মাও নিজেরাই করতে ভালবাসে। আবার এমন কতগুলি কাজ আছে মহামায়ার যা করতে নেই, করলে ভাল দেখায় না বা অন্য কাউকে করতে না দিলে খারাপ দেখায়। তা ছাড়া মহামায়ার আছে ঘেন্না। গা ঘিন্ ঘিন্ করা উৎকট অদ্ভুত ঘেন্না। মনের জোরে দরকারের সময় কখনও যদি বা ঘেন্না সে দমন করতে পারে, পেটের যা কিছু হঠাৎ গলা দিয়ে বার হয়ে আসতে চাইলে কোনমতেই চেপে রাখতে পারে না। নিজের বমি দেখে নিজেই ঘেন্নায় সে আধমরা হয়ে যায়। ছোট ছেলে-মেয়ের কতগুলি কাজও সে তাই করে না।

তবু যা করে, তার জন্যই বাড়ীর লোক উঠতে বসতে তাকে অনুযোগ দেয়। ওই শরীরে এত কাজ করা কেন? বাড়ীতে ঝি-চাকর নেই? কাজ করার আর মানুষ নেই? একজন যখন একজনের কাছে জল চাইল, একজনকে এক গ্লাস জল দেবার সুখ থেকে বঞ্চিত করতে ওরকম ওৎ পেতে না থাকলেই কি তার চলে না? ভাবি ভাবি কাজও করবে, টুকিটাকি কাজও করবে—কি এমন মধু আছে রে বাবা কাজে! আর শুধু কি কাজ করা? থেকে থেকে এমন এক একটা কাণ্ড করে বসবে—

অনুযোগ শুনতে শুনতে অবসন্ন শরীর এক এক সময় ভেঙে পড়তে চায় মহামায়ার, মনে হয় কেউ যদি চোখের পলকে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত! স্বপ্নহীন গাঢ় ঘুম,—হাত দু'টিকে যখন যে কোন একটা কাজে আটকে রাখবার ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না। ঘুম গাঢ় না হলেও মহামায়ার হাত নিয়ে স্বস্তি নেই। ঘুমের মধ্যেও হাত দু'টি তার বিছানা হাতড়ায়, চাদর গুটিয়ে তোলে, ছেঁড়া থাকলে সেই ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে চাদর বা বালিশের ওয়াড় ফালা ফালা করে দেয়, তোষক বালিশ খুটে খুটে তুলো বার করে ফেলে, মুঠোর মধ্যে যা কিছু পায়

দূরে ছুঁড়ে মারে। তার বিছানার ধারে-কাছে আর কারও শোবার উপায় নেই। স্বামী যদি তার বেঁচে থাকত, কে জানে একদিন সকালে উঠে দেখা যেত কিনা, তার হাত দু'টি গলা টিপে স্বামী বেচারীকে মেরে রেখেছে!

সুখের বিষয় শরীরটা তার কাঠির মত সরু,—হাতের মত সবলও নয়, পাগলও নয়। দেহ যদি তার ঘুমের মধ্যে অবাধ্য হতে আরম্ভ করত আর ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে তাকে তুলে তার হাত দু'টিকে যেখানে খুসী পৌঁছে দিত, কি যে তা হলে হত, ভাবলেও মহামায়ার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

এমনিই হাতের জ্বালায় জীবন তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডান হাতে কলের হাতল ঘোরায়, বাঁ হাতে রুমালের কাপড় সুচের নীচে এগিয়ে দেয়, আর মনে মনে নিজের বিস্মৃত ও স্বর্গীয় এক পিতৃব্যের মুণ্ডপাত করে। ছেলেবেলা তাকে নিয়ে মোটরে চেপে যাবার সময় তিনি নাকি একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিয়েছিলেন, পিঠে আর হাঁটুতে চিহ্ন আছে।

তারপর থেকে নাকি সে রোগা হ'যে গেছে, পাশে বাড়ে নি লম্বায় বাড়ে নি,—কেবল তার হাত দু'টি বেড়েছে স্বাভাবিক বাড়।

নির্জ্জন দুপুর, কলের মৃদু একটানা আওয়াজ, চেয়ারে বসে' বসে'ই বারীণের ঢুল আসছিল। মহামায়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, আমাকে খুব বিচ্ছিরি দেখায়, না?'

বারান্দায় মাদুরে পাটিতে মেয়েরা শুয়েছে, স্বামীর চিৎ হবার চেয়ারে বারীণের জুতোর আওয়াজে ভাঙা কেতকীর ঘুম হয়ত এতক্ষণে আবার ফিরে এসেছে, ঘরটা তাই জিনিসে ভরা হ'লেও কেবল একজন পুরুষ আর একজন নারী থাকায় মনে হচ্ছিল নির্জ্জন।

প্রশ্ন শুনে বারীণ চেয়ারেই জড়সড় হয়ে বলল, 'না, বয়েসের তুলনায় আপনাকে বরং ঢের বেশী কচি দেখায়।'

'তা বলছি না, বলছি হাত দুটোর জন্যে আমায় খারাপ দেখায় তো? আচ্ছা তা দেখাক। আপনি তো আজ বাদে কাল ডাক্তার হবেন, বলুন তো, ছোটবেলা মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট হ'লে আমার মত হয় কিনা?'

'আপনার মত কি হয়?'

'বেখাপ্পা দেখতে হয়—শরীরটা এম্নি শুকিয়ে যায় কিন্তু হাত দুটো ঠিকমত বড় হয়। ছেলেবেলা আমার এক কাকার সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গিয়ে আমার এ দশা হয়েছে, তা বুঝি জানেন না?'

বারীণের হাসি দেখে মহামায়া মাথা হেলিয়ে জোর দিয়ে বলল, 'সত্যি। সবাই জানে। নইলে আমি বুঝি আপনা থেকে এমনি হয়েছি?'

বারীণ হাই তুলে বলল, 'আপনা থেকে হয়েছি মানে? আপনি তো এমনি—এমনি গড়ন আপনার। আপনার বাবার কি মার নিশ্চয় একরকম গড়ন ছিল,—নয়তো কোন এক পূর্ব্বপুরুষের ছিল। Cell-এর মধ্যে যে genes থাকে—

প্রেসে বড় একটা মেশিন চলতে আরম্ভ করেছে তবু সেলায়ের হাত-কলটার মৃদু একটানা শব্দ সুরের মত স্পষ্ট। এবার আরও তাড়াতাড়ি বাকী রুমালগুলি সেলাই হয়ে গেল। হাতের কাজও যেন ফুরিয়ে গেলে বাঁচে।

বারীণকে রুমাল দিয়ে মহামায়া বলল, 'কই, পাঞ্জাবীর কাপড় তো এনে দিলেন না?

'না, না, আপনার ঘাড়ে অত চাপানো উচিত হবে না।'

'ঘাড়ে চাপানো!'—মহামায়া মৃদু হাসল, 'বাড়ীর কেউ জামা চায় না,

কিছু চায় না, বলে আমার ছাঁটকাট সেলাই ভাল নয়। সে কথা না বলে' ঘাড়ে চাপানোর কথা কেন ?'

বারীণ বলল, 'তা' কেন, আপনি চমৎকার ছাঁটেন, চমৎকার সেলাই করেন। আজকেই সন্ধ্যের সময় কাপড় এনে দেব।'

কেতকী জেগেই ছিল, বারীণকে চলে' যেতে দেখেও কিছু বলল না, কেবল তাকানতে একটু নতুনত্ব এনে মহামায়ার দিকে তাকাল।

মহামাযার একবার মনে হল, বুকে একটা ছেলে না ঘুমিয়ে থাকলে এভাবে কেতকী তাকাতে পারত না। তারপর আবার নিজেকে মহামাযার অবসন্ন মনে হতে লাগল। হাতের ভার বহন করে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন কষ্ট হয়। কি নির্ভয়, নিশ্চিন্তভাবে সকলে নিশ্চল হয়ে ঘুমিযে আছে। কারও হাতেব আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত একটু নড়ে না। মীনা পাশ ফিবে শুল, হাত দুটি তাকে পাশ ফিরতে সাহায্য করল, তারপর আবাব নিশ্চল হযে এলিয়ে পড়ল। তাব হাত হলে ? এমন কিছু হয়ত একটা কবে বসত সকলে জেগে উঠে যা নিযে হৈ চৈ করে তারও ঘুম ভাঙিয়ে দিত, বলত, 'ত্থাখো, তোমার কীর্ত্তি।'

ভুলেও কথনো বলত না, 'ত্থাখো, তোমাব হাতের কীর্ত্তি।'

সন্তর্পণে মীনার পাশে বসে মহামায়া তার ডান হাতের কাছে নিজের ডান হাতটি রাখল। মীনার চেয়েও তার হাত সবল আর সুডৌল—শুধু হাত দিয়ে বিচার করলে তাব মত রূপসী মিলবে না।' তবু এই হাতের জন্য মানুষটা সে বেঢপ, বেথাপ্পা,—এই হাতের জন্য পদে পদে তার অশান্তি, উদ্বেগ। একরকম চ্যাপ্টা বেমানান একটা বাঁকা হাত নিয়েও মীনার জীবনে সুখের বন্যা—

'উঃ! উঃ!' শব্দ করে' মীনা ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই মহামায়া মীনার

হাত ছেড়ে দিল। নিজের হাতে হাত বুলোতে বুলোতে মীনা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, তোমার হয়েছে কি বৌদি? হাতে একটু জোর আছে বলে' আমার হাতটা গুঁড়ো করতে এসেছ কেন? পালোয়ানের কাছে যাওনা? গুণ্ডার কাছে যাওনা? বারীণদার সঙ্গে লাগ না গিয়ে?'

মহামায়ার কান্না আসবার উপক্রম হয়ে এসেছিল। সজল মৃদুস্বরে সে বলল, 'হঠাৎ মনের ভুলে তোর হাত চেপে ধরেছি মীনা, একটা কথা ভাবতে ভাবতে—'

মীনা ঝেঁঝে উঠে বলল, 'মনের ভুলে তো তুমি সবই কর। চুল ধরে টানো মনের ভুলে, দামী শাড়ী ছিঁড়ে ফেল মনের ভুলে, হাত চেপে ধর মনের ভুলে,—হাত দুটো কেটে ফেলতে তো পার না মনের ভুলে?'

এ ভৎর্সনায় ঘুমিয়ে থাকা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব। তারা জাগল। জেগে উঠেই জানবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, কি হয়েছে, কি হয়েছে?

'ঘুমোচ্ছিলাম, আমার হাতটা মুচ্‌ড়ে ভেঙে দিয়েছে।'

মহামায়ার প্রতিবাদের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা করে সকলে আবার কলরব করে উঠল। একজন মহামায়ার একটি হাত উঁচু করে নেড়ে চেড়ে দেখে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল, 'হাত তো নয়, গদা যেন।'

মহামায়া নীরবে উঠে গিয়ে রেলিঙের সেইখানে দাঁড়াল। মীনার হাত সে মুচড়ে ভেঙে দেয় নি, মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে একটি ফুলের চারা। এখনও সেটি নীচে কল-ঘরের ছাদে পড়ে' আছে।

• সাতটার সময় বারীণ সাতগজ পাঞ্জাবীর কাপড় নিয়ে এল। নীচে প্রেস তখন বন্ধ হয়ে গেছে, কাজ হচ্ছে কেবল দপ্তরীর ঘরে।

এ সময় মুহূর্ত্তের জন্য মহামায়ার হাতের স্থির হবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু আজ মহামায়া চুপচাপ বারান্দায় বসেছিল, দু'হাতে ধরে ছিল

রেলিঙের শিক। এ সময় এ অবস্থায় তাকে কেউ কোনদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারে না,—এ বাড়ীর লোকেদের তুলনায় সে যেমন বেমানান, তার দেহের তুলনায় তার হাত দু'টি যেমন বেমানান, এসময় এভাবে তার বসে থাকা যেন তার চেয়েও বেমানান। কেতকীর স্বামী তার গদি-আঁটা চেয়ারে চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে, কেতকী নিজের ছেলের কান্না থামাতে না পেরে পাগল হয়ে উঠেছে, আরও চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে চেঁচাচ্ছে। ভাঁড়ার বার করে দিতে গিয়ে মীনা প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করছে, স্কুল কলেজ থেকে ফিরে একবার যারা খাবার পেয়ে খায় নি, এখন বেড়িয়ে ফিরে খাবার চেয়ে তারা পাচ্ছে না, রান্নাঘর থেকে কিসের একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মহামায়ার বুড়ী শাশুড়ী কাসতে কাসতে মরে যাবার ভয় দেখাচ্ছেন।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মহামায়া একবার তার গদা দু'টি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেই সব গোলমাল থেমে যায়, কিন্তু আঁচল সে জড়িয়ে রেখেছে গায়ে, আঙুল দিয়ে দু'টি গদাকেই বেঁধে রেখেছে রেলিঙের শিকে। মানুষের উপর তার অভিমান হয় নি, ঘেন্না সে করছে নিজেকে। যে অনুভূতি তার মধ্যে সব চেয়ে প্রবল সেই অনুভূতিই আজ কেবল নাভীর মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি বমি করে ফেলল।

কোমরে আঁচল জড়ালে এ ভাবটা কমে যাবে কিনা, বাবীন আসবার অনেক আগে থেকে সে এই কথাটাই ভাবছিল। কোমরে-আঁচল জড়িয়ে সে যে রহস্যের সৃষ্টি করে, তার পীড়ন সকলে যে শুধু তার কোমরে আঁচল জড়ানো-সেবার জন্য সহ্য করে মহামায়ার তা অজানা নয়। বমি' বমি' ভাব সামলাতে হলে নাভির কাছে খুব আঁট করে তাকে আঁচল জড়াতে হবে। এই সরু কোমর তার, আঁচল আঁট করে বাঁধলে কি অকথ্য সরুই দেখাবে কোমর!—আর তার তুলনায় কি অসম্ভব বিশাল দেখাবে তার হাত!

লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল মহামায়ার। নিজেকে সামালবার আঁচল সংক্রান্ত পরীক্ষাটুকু করার সাহস সে পাচ্ছিল না।

বারীণ কাপড় নিয়ে আসতে সে উঠে দাঁড়াল। সিল্কের কাপড় দেখে খুসী হয়ে বলল, 'সিল্ক ?'

বারীণ বলল, 'হ্যাঁ। ভাল জামা করা চাই কিন্তু।'

'এ হাতে কি আর ভাল জামা হয় ঠাকুরপো ?

দু'চোখে জল নেমে এল মহামায়ার। বারীণদের বাড়ীর আলোকিত জানালাগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড় অবাধ্য, বড় কুচ্ছিৎ হাত। কি যে করি আমি হাত দুটো নিয়ে!'

কম্পোজিং রুমে টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে, ছাপাখানা অন্ধকার। দপ্তরীখানার ভেতরটা আলোয় ঝলমল করছে। খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা আর খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা দেখা যায়, যন্ত্রে ফেলে বুড়ো দাড়িওলা দপ্তরী ছাপা ফর্ম্মা কাটছে। দেখতে দেখতে মহামায়ার হাত এদিকে এগিয়ে যায় বারীণের দিকে। বারীণ সাহেবী পোষাকে বেরিয়েছিল, সেই বেশেই সোজা এখানে এসেছে। মহামায়ার ডান হাত এগিয়ে গিয়ে তার কোটের মাঝের একটা বোতামকে পাকড়াও করে' পাক দিতে থাকে। মুখে বমি করার ভাব ফুটে আছে ভেবে মুখ মহামায়ার ফেরানো থাকে অন্যদিকেই। কয়েকটা মোচড় খেয়েই বারীণের কোটের বোতামটি আলগা হয়ে খসে আসে। মহামায়া তখন পাকড়াও করে তার উপরের বোতামটিকে।

সেটি খসে' এলে, নীচেরটিকে।

কেতকীর স্বামী চিৎ হয়ে থেকেই মৃদুস্বরে ডাকে, 'বৌঠান, ও বৌঠান ?'

মহামায়া মুখ ফিরিয়ে আনতে আনতে বারীণের সে বোতামটিও খসে'

আসে। অন্য একটি বোতাম ধরে মহামায়া আরও মৃদুস্বরে বলে, 'কেন ঠাকুরপো ?'

'ওকি করছ ?'

'কি করছি ?'

'বোতাম ছিঁড়ছ কেন বারীণের ?'

'বোতাম ছিঁড়ছি ?'—মহামায়া চমকে ওঠে, 'ওমা তাইতো !'

একবার নিজের হাতের বোতামগুলি আর একবার বারীণের কোটের বোতামের খালি ঘরগুলির দিকে তাকায় মহামায়া, নিশ্বাস ফেলতে যাওয়ায় মনে হয় ভেতরে যা কিছু আছে সব তার বেরিয়ে আসতে চায়, কেবল ছিদ্রগুলি ছোট বলে পারছে না।

একটু সরে দাঁড়ায় মহামায়া। কিন্তু কতদূরে আর সরে যাবে ? সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে মীনা কেতকীর স্বামীকে বলে, 'বোতাম ছেঁড়ার কথা কি বলছ মেজদা, সারাদিন আজ কত কি ছিঁড়েছে হিসেব রাখ কিছু ? আমার সেই যে ঘাসের রঙের শাড়ীটা কিনে দিয়েছিলে, নবুদের বাড়ী নেমন্তন্নে গিয়ে কাল নিজেই উনি তাতে চুণ লাগালেন। ওবেলা ধুয়ে রেলিঙে মেলে দিয়েছি, কখন কাছে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা ফালা ফালা করে ছিঁড়েছেন। তারপর খোকাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে দিলেন ওর মুখে আস্ত চামচেটা সেঁদিয়ে। দুপুরে তোমার টুথ ব্রাশ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে তোমার অত সাধের চারাটি টব থেকে তুললেন, তুলে মুচড়ে ফেলে দিলেন। আমি এই বারান্দায় ঘুমোচ্ছি পাটি পেতে, বলা নেই কওয়া নেই, পাশে বসে এমন মুচড়ে দিলেন আমার হাতটা, এখনো কন্ কন্ করছে।'

কোমরে আঁচল বেঁধে যে দু'হাতকে খাটায়, মীনার কথা শুনতে শুনতে বমি থামাবার জন্য সে মুখে আঁচল গুঁজে দিয়েছে। বারীণের সিল্কের থান মাটিতে ফেলে বারীণের একটা হাত ধরে টানতে টানতে

সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কেতকীর স্বামী একবার আর সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়ীর দু'জন মেয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছে, মুখ থেকে আঁচলও সে সরাল না, কথার জবাবও দিল না।

একেবারে নীচের তলায় নেমে ঢুকল গিয়ে দপ্তরীর ঘরে।

'মরতেও দিও না ভাই ঠাকুরপো। বাঁচিও।'

বলে' বাঁধানো বই কাটবার যন্ত্রে ফেলে কনুয়ের নীচ থেকে নিজের দু'টি হাতকে মহামায়া কেটে বাদ দিল। নিজের রক্তে-ভেজা কয়েকটা বই খাতা আর ছাপানো ফর্ম্মার ওপর টলে' পড়ে' জ্ঞান হারাবার আগে বলল, 'অবাক হোয়ো না ভাই, লোকে আত্মহত্যাও করে। রক্ত থামিয়ে বাঁচাও। তোমার পাঞ্জাবী আর তৈরী করে দিতে পারলাম না।'

নীচে মাদুরে বই-খাতার ওপর পড়ে রইল হস্তবিহীনা মহামায়া, লোহার যন্ত্রের ওপর একরাশ সরু সরু কাটা কাগজের ওপর পৃথক হয়ে রইল দু'টি নিস্পন্দ হাত।

বিড়ম্বনা

স্কুল নিয়ে বুড়া শিবরামের মাথা ব্যথার অন্ত নেই। দশ বছর আগে একমাত্র মেয়ে মহাশ্বেতার বিয়ের পর জীবনের এই অবলম্বনটি সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন, আজ মেয়েকে চোখের আড়াল করার সব প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্কুল নিয়েই তিনি মেতে আছেন। ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ের কাছে শেষ জীবনে মানুষ আর কী সান্ত্বনাই বা সংগ্রহ করতে পারে!

সে আর বেঁচে থাকার অবলম্বন নয়,—বাধা।

দশ বছর স্কুল হয়েছে, দশবছরে অন্ততঃ দেড়শ' ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি ছেলেও অন্ততঃ দশ টাকার একটা স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারল না বলে শিবরামের অসীম আপশোষ। সম্প্রতি এই আপশোষের অন্ত করতে বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য ত্রিলোচনকে বিদায় দিয়ে তিনি নতুন একজন হেড্‌মাষ্টার এনেছেন।

নতুন হেডমাষ্টারের নাম অনন্ত। ছত্রিশ বছর বয়সে রূপের তার অন্ত নেই, সপ্তাহে একদিনের বেশী কামাতে মনে থাকে না বলে মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়িগোপের জন্য রূপের যেটুকু হানি হয় দর্শকের সে যেন ব্যক্তিগত ক্ষতি। প্রকৃতিটা একটু অদ্ভুত, মাঝে মাঝে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত খাপছাড়া ব্যবহার করতে ভালবাসে। স্কুল সংলগ্ন ছোট একতলা বাড়ীটিতে ঠাকুর চাকর নিয়ে বাস করে, নাওয়া খাওয়া ইত্যাদি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির প্রতি সে পরম

উদাসীন। দুটি অতি আশ্চর্য্য বিলাসিতা কেবল তার আছে—রাত্রি জাগরণ এবং দিনে সাত আটবার চা পান। চা পানের বিলাসিতাটা সাধারণ নেশার পর্য্যায় ভুক্ত বলে সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘরের সামনে খোলা বারান্দায় কোন নেশায় যে সে জেগে বসে থাকে, কল্পনা করা কঠিন।

হয়ত তারা গোণে। রাত জেগে তারা গুণতে ভালবাসে এমন মানুষের অভাব তো নেই পৃথিবীতে!

অথবা হয়ত ভাবে। রাত জেগে চিন্তার জাল বুনে যায় এমন মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নয়।

সকালে বেড়িয়ে ফেরার পথে শিবরাম অনন্তের সঙ্গে খানিকক্ষণ স্কুল সংক্রান্ত আলাপ করে আসেন।

বিশৃঙ্খল ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'স্কুলের কাজে তোমার এত শৃঙ্খলা, ঘর এমন নোংরা কেন?'

অনন্ত হাসে,—'কর্ত্তব্য আর খেয়ালের মধ্যে এটুকু পার্থক্য থাকবেনা?'

শিবরাম বলেন, 'তা যেন রইল, তবু—বলি, একা থাক কেন? কেউ নেই নাকি আপনার লোক?'

'নাঃ'—বলে অনন্ত হাসতে থাকে।—'নিজের চেয়ে আপনার লোক আর কে আছে বলুন? নিজেই যদি ঘর নোংরা রাখতে ভালবাসি—'

'ভালবাসো? আমার মেয়ে শুনলে তোমায় কিন্তু পাগল বলত বাবা! আর এ ঘরে এলে ব্যাপার দেখে সে নিজেই পাগল হয়ে যেত! বিধবা হয়ে অবধি ঘর সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে—'

মুহূর্ত্তে কল্পনায় যা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের তাতে বাকরোধ হয়ে যায়। খানিক নীরব থেকে নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'যাক, ও ছাড়া আর করারই বা আছে কি! ওসব কথা থাক অনন্ত। সহ্য হয় না।'

এমন ভাবে প্রসঙ্গ পবিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন যেন অনন্তই তাব মেয়ের দুবদৃষ্টেব কথা তুলেছিল !

ক্ষণকাল শিববামেব মুখেব দিকে চেয়ে থেকেই অনন্তেব দৃষ্টি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। দৃষ্টিকে সে আড়াল কবে চশমাটা ঠিক কবে বসবাব ছলনায়।

অতঃপব স্কুলেব প্রসঙ্গ ওঠে। শিববাম ধীবে ধীবে এমনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন যে অনেক আবোল তাবোল কথাও বলে ফেলেন।—

'শুধু স্কলাবসিপ পাওনা নয় অনন্ত, তক্ষশিলা বাজগৃহে যেমন একদিন দেশ বিদেশেব ছেলে জড়ো হত, আমাব স্কুলে তেমনি বাংলা দেশেব সেবা ছেলেগুলি জড়ো হবে, —এ যদি কবতে পাব তবেই বুঝব তুমি হেড মাষ্টাব !'

বৃদ্ধেব এই অসম্ভব আশাতে অনন্তেব হাসি পায না, সে গম্ভীব মুখেই বলে, চেষ্টা কবব বৈকি।'

শ্বেতা প্রশ্ন কবে 'নতুন হেডমাষ্টাবটি বুঝি খুব ছেলেমানুষ বাবা ?'

শিববাম বলেন, 'না, মাঝ-বয়সী। ছেলেমানুষ হেডমাষ্টাব দিয়ে কি স্কুলেব উন্নতি হয় ? এমন লোক চাই যাব অভিজ্ঞতাও আছে, আবাব বুড়ো হয়ে কাজেব ক্ষমতাও হাবিয়ে ফেলেনি।'

শ্বেতা স্মিত মুখে বলে, 'মাঝবয়সী লোক ছাড়া অমন সমন্বয় হয না বটে। তোমাব বুদ্ধি দেখে সময সময আশ্চর্য্য হয়ে যাই বাবা। স্কুলেব সব ব্যবস্থা নাকি তিনি উল্টে দিচ্ছেন ?'

'ব্যবস্থা উল্টেও দিচ্ছে, সংস্কাবও কবছে। যে সব মাষ্টাব ক্লাসে ঘুমোত আজকাল প্রাণপণে পড়াচ্ছে তাবা।'

সাত বছবেব ছেলে কুনালকে কাছে টেনে নিয়ে শ্বেতা বলে, 'খোকাকে তাহলে এবাব স্কুলে ভর্ত্তি কবে দিই কি বল ? আমাব বিদ্যে তো ফুবিয়ে এল।'

শিবরাম ভেবে বলেন, 'স্কুলে দিবি ? দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত ওকে না দেখে যদি পাগল হয়ে যাস ?'

'কি যে বলো তুমি !' বলে শ্বেতা হাসে, কিন্তু হাসির শেষটা অন্তরালের চোখের জলে ভিজে ওঠে। দশটা থেকে চারটা অবধি ছেলেকে চোখের আড়াল করার অনাগত সম্ভাবনায় নয়, না দেখে পাগল হয়ে যাওয়ার কথাটাতেই ব্যথা বাজে ! অতি বড় অনুচিত মিথ্যা ! কর্ত্তব্যের কাছে শোক দিনের পর দিন ছোট হয়ে চলেছে। এমন গ্লানিকর ব্যাপার তারি জীবনে সত্য হয়ে উঠল। এ চিন্তায় চোখে জল আসা আশ্চর্য্য নয়। সারাজীবন স্বামীকে না দেখার অভিশাপ যার কাছে সহজ ও সহনীয় হয়ে এল, ক'ঘণ্টা ছেলেকে না দেখে সে কাতর হবে ? লজ্জাকর পরিহাস।

কুনাল দাদুর পাশের আসনটি দখল করে বসে অনর্গল কথা আরম্ভ করে দেয়, তারপর একান্ত অসময়েই রূপ কথার রস-বৈচিত্র্য প্রার্থনা করে। শ্বেতা সরে যায় জানালায়।

কেন এমন হয় ? না চেয়ে জীবনের প্রথাহীন খাপছাড়া বৈচিত্র্য জুটেছিল, চিরন্তন দীপশিখার ধোঁয়া থেকে কলঙ্ক তিলকের কালি সংগ্রহ করেও ভীতা সে তিলক পরেনি, বৈধব্যের বেদনায় আজো তার আপশোষ মিলিয়ে গেলনা কেন ? অনুতাপে আজ এত মাধুর্য্য কেন, মুক্তির গৌরবে দাহ ? জীবনের সব যে মুছে গেল তার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত কালিমার অভাবটাই আজ যেন বড় হয়ে উঠেছে ! এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে জীবনে !

শ্বেতার আহ্বানটা শিবরাম নিজেই অনন্তের কাছে পৌঁছে দিলেন। বললেন, 'সময় করে একবার যেও হে অনন্ত, মেয়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।'

অনন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'কেন ?'

'ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া সম্বন্ধে তোমার কাছে তার নাকি কতগুলি অনুরোধ আছে। নিজের মুখে জানাতে চায়। আমি শুনতে চাইলাম, বললে না।'

অনন্ত আন-মনে বলল, 'তবেই মুস্কিল।'

শিবরাম অবাক। 'মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?'

অনন্ত অকারণে বিব্রত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে না, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। আপনার মেয়ে যদি কোন অন্যায় অনুরোধ করেন—'

কথাটা বড়ই অসঙ্গত ও খাপছাড়া কৈফিয়তের মত শোনাল। মেয়ের সম্বন্ধে এমন অন্যায় অনুমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে শিবরাম বললেন, 'না, তা করবে না—আমি তোমায় কথা দিতে পারি। নিজে সে অন্যায়কে এমন ঘৃণা করে যে অন্যায় অনুরোধ তার গলায় আটকে যাবে।'

অনন্ত অধিকতর বিব্রত ও ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তা জানি গাঙ্গুলী মশাই, তা জানি। ওরকম ভাবে কথাটা বলিনি, আমি ভাবছিলাম—'

কি যে সে ভাবছিল তা অপ্রকাশিতই রইল। তার মুখ এমনি চিন্তাসক্ত হয়ে উঠল যে শিবরাম আর একবার বিস্মিত হয়ে গেলেন।

বিকালের দিকে নিজের ঘরে বসে শ্বেতা একটা অদ্ভুত আত্মচিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে ছিল। হিমানী তার সমবয়সী মাসী, তার শিশু পুত্রটি এইমাত্র কেঁদে মার কাছে ফিরে গেছে। আধ ঘণ্টারো বেশী মাকে ছেড়ে সে খুসী হয়েই মাসতুতো দিদির সোহাগ সহ্য করেছিল, এ জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে রাগ করার মধ্যে যে কত বড় অসঙ্গতি আছে শ্বেতার তা জানা ছিল না। কোথা থেকে খেলায় ব্যাপৃত কুণালের কলরব ভেসে আসছিল, শ্বেতার বুকে জেগে উঠছিল একটা ক্ষুব্ধ অভিযোগ। সন্তান শিশু হয়ে থাক এ' কামনা হয়ত কোন মা-ই করে না, কিন্তু শিশু না থাকলেই বা মায়ের চলে কি করে! একান্ত অসহায় একটি জীবের হাসি কান্নার

বৈচিত্র্য, স্নান করানো কাজল পরানো দুধ খাওনো ঘুম পাড়ানো থেকে মুখে মাই তুলে দেবার প্রয়োজন, একবার যে মা হয়েছে তার তো কোন দিনই ফুরিয়ে যায় না। কুণালের বয়সটাকে শ্বেতা আজকাল যেন হিংসা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কেন এত বড় হয়ে গেল? দশ মিনিট কোলে করে থাকলে কোমর ব্যথা হয়, হাঁপ ধরে যায়, একি বিড়ম্বনা তার।

এক ছেলের মা হয়ে দিন কাটবে এই কি তার জীবনের চরম হিসাব নিকাশ?

ঝি এসে সংবাদ দিল নতুন হেড মাষ্টার এসে বসে আছেন।

'বাবা বইবে ঝি?'

'বেড়াতে গেছেন বুঝি, কে জানে।'

শ্বেতা চিন্তিতা হয়ে বলল, 'তবে আমি কি করি বলত? আড়াল থেকেই কথা বলব অবশ্য, কিন্তু বাবা না থাকলে—'

'আজ যেতে বলব দিদিমণি?'

'না, আমি যাচ্ছি। কুণাল কোথায় ডেকে আনত।'

অনন্তকে শিবরামের বসবার ঘরে বসানো হয়েছিল, শ্বেতা অন্দরের দিকের দরজার একপাট বন্ধ করে বাঁ হাতে দরজার প্রান্ত চেপে আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ জানাতে বড় সঙ্কোচ বোধ করচি।'

অনন্ত এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে দরজা বেয়ে একটা কাঠ পিঁপড়ের ঊর্দ্ধগতি নিরীক্ষণ করছিল, দরজার প্রান্তে খানিকটা শ্বেত বসন ও কয়েকটি শুভ্র আঙ্গুলের আবির্ভাব দেখে বুঝল ওদিকে কে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে একটু অকারণ হাসি হেসে সে বলল, 'অনুরোধ জানাতে যদি সঙ্কোচ হয়, আপনি আদেশ করতে পারেন।'

অন্তরালে শ্বেতার বিস্ময়ের সীমা নেই! এ কেমন ধারা কথা? গলার

স্বরটাও যেন চেনা মনে হয়! উঁকি মেরে দেখার কৌতুহল দমন করে শ্বেতা বলল, ‘আপনাকে আমি আদেশ করতে পারি না, অনুরোধই করছি। আমার ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে চাই, কিন্তু ও স্কুলে যেতে চাইবে না। প্রথম কয়েকদিন আপনি যদি দয়া করে এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যান—’

বাঁ হাতের আঙ্গুলে কড়া হাতের স্পর্শ পেযে শ্বেতা চমকে থেমে গেল, তারপর দরজার পাটটা খুলে ফেলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘কি স্পর্দ্ধা আপনার!’

রাগে তার মুখ লাল হযেই উঠেছিল, কিন্তু অনন্তের মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত্তে কাগজের মত শাদা হযে গেল।

অনন্ত গম্ভীর মুখে বলল, ‘স্পর্দ্ধা নয শ্বেতা। পিঁপড়ে।’

‘পিঁপড়ে কি?’

‘কাঠপিঁপড়ে—যা কামড়ালে আঙ্গুল ফুলে যায, খুব ব্যথা হয়।’

‘কই পিঁপড়ে?’

মেঝে থেকে পেষা পিঁপড়েটা তুলে হাতের তালুতে রেখে মৃদু হেসে অনন্ত বলল, ‘এই যে। বিনা কারণে এতকাল পরে তোমার আঙ্গুল ছোঁব কেন? আড়াল ঘুচিযে দেবারও কোন ইচ্ছাই আমাব ছিল না। গলা শুনে যে চিনতে না পাবে—’

শ্বেতা আহত হযে বলল, ‘চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ সে চেনাকে আমি স্বীকার করব কেন? তোমায চেনা আজ আমার অনুচিত নয়?’

অনন্ত হাসল, ‘কি জানি! উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে তোমার আজ কি সম্পর্ক আমার জানা নেই। কিন্তু অনুচিত যদি, এখন স্বীকার করলে কেন যে আমায় তুমি ভাল করেই চেনো?’

‘তুমি মুখোমুখী দাঁড়ালে বলে। একটু বসি, মাথাটা ঘুরছে।’

চেযার প্রত্যাখ্যান কবে শ্বেতা জানালায গিযে বসল। কপালে তাব বিন্দু বিন্দু ঘাম, নিশ্বাসে চাপা ঝড়ের ইঙ্গিত। একথা বিশ্বাস কবতেও ভয হয যে এতকাল পবে এমন অকস্মাৎ সে আবাব অনন্তেব সঙ্গে একঘবে বসে আছে। প্রকৃতিব কালবৈশাখী ওঠে বহুক্ষণব্যাপী গুমোটেব নোটিশ দিযে, তাব জীবনেব এই সব প্রলযঙ্কব ব্যাপাবগুলি কি কোন নির্দ্দেশ না দিযেই এমন ভাবে সহসা তাকে কাতব কবে তুলবে! তার মনে আজও অনন্তেব স্থান যে কোথায এই বিচলিত ভাব এই চাঞ্চল্য তা কি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ কবে দিল! যদি সে জানত অনন্ত আজ আসবে, প্রস্তুত হযে থাকাব সময পেযে সে কি এখন হাসিমুখে কথা কযে শান্ত আত্ম-সমাহিত ব্যবহাব কবে নিজেকে গোপন বাখতে পাবত না? এ কি বিডম্বনা।

এমন ভাবে হৃদয অনাবৃত হযে যাওযাব লজ্জা সে এখন কোথায় বাখে?

অনন্ত বলল, 'আমায তোমাব বসতে বলা উচিত শ্বেতা। মনে বেখো আমি যেচে আসিনি, তুমি ডেকে এনেছ। অতিথিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দেওযা এদেশেব প্রথা, তুমি অন্ততঃ বসতে বলো!' ব'লে হেসে অনন্ত নিজেই একটা চেযাবে বসল। অকস্মাৎ গম্ভীব হযে বলল, 'এব কোন মানে হয না, বুঝলে? তোমাব এ নীবব প্রতিবাদ অর্থহীন। জান, তোমাব কপালেব ঘাম মুছিযে দিলে আজও একটু অস্বাভাবিক হযনা? হাসি মুখে কথা কও। তা না পাবো, কবিত্ব কবে বলো, হে আমাব জীবনেব শনি, হে আমাব প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক, অভিমান ভুলে তুমি যে আমায আবাব খুঁজে নিলে এতে আমি ধন্য হলাম। তোমাব অকল্যাণেব তীব্র প্রেমে আমায ঢেকে দাও, ঘিবে বাখো!'

শ্বেতা কাতব হযে বলল, 'চুপ কব। তুমি অমন কবে বললে আমাব চিন্তা শক্তি অসাড হযে যায। ভাল মন্দেব জ্ঞান লোপ পায। চিবদিন তোমাব কাছে কি পীড়নটাই আমি পেলাম!'

'তুমি কি সহজ ভাগ্যবতী শ্বেতা! তোমার জীবনের ইতিহাস জানলে বাংলার লাখো মেয়ের বুক হিংসায় ফেটে যাবে! বৈচিত্র্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন ও সার্থকতার মাপকাঠি। তোমার জীবনে কি অসাধারণ বৈচিত্র্য আমি এনে দিয়েছি? এক দিকে ধনী মাতাল স্বামীর বিকর্ষণ, অন্যদিকে কবি ভাবুক প্রেমিকের আকর্ষণ! সকলের ভাগ্যে একি জোটে!'

শ্বেতা বিস্ফারিত চোখে শুনছিল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তবু আমার মত দুঃখী কেউ নেই।'

'দুঃখই তো জীবনের সেরা বৈচিত্র্য'—বলে অনন্ত হাসল।

শ্বেতা কিন্তু এ কথার জবাব দিল অপ্রত্যাশিত উষ্ণতার সঙ্গে—'তুমি মিথ্যা বলছ। দুঃখ জীবনের বিড়ম্বনা। ছাব্বিশ বছরের বুড়ীকে তুমি দার্শনিক তত্ত্ব কথা শোনাতে এসোনা আজ। আমার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে কিসে জানো? তোমার দেওয়া দুঃখে।'

অনন্ত স্মিত মুখে বলল, 'আমি কোন দিন তোমার একথার প্রতিবাদ করব না শ্বেতা। আমি কেবল বলব, দশ বছরের বিরহীর কাছে দার্শনিক তত্ত্ব কথা শোনার ভাগ্য সকলের হয় না।'

'দশ বছরের বিরহী!'

'ব্যঙ্গ করলে?'

'না।'

'ইচ্ছে করলে করতে পার। কিছু এসে যায় না। কিন্তু সত্যি শ্বেতা, মন দিয়ে আমার উপদেশ শুনলে তোমার মনের প্রসারতা বাড়ত!'

শ্বেতা ক্লিষ্ট-স্বরে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না।'

অনন্ত তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে বলল, 'আমিও না। আমাদের ঝগড়ার সময় এখনো আসেনি, কি বল?'

একথার জবার না দিয়ে শ্বেতা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। বাগানের দীঘিটা চোখে পড়ে, দীঘির জল নাচিয়ে বায়ুর খেলা। বুকভরা ছোট ছোট উর্ম্মি, চারিদিকে তট। তটে তটে তটোর্ম্মির সন্ধি।

দীঘির পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে কুণাল জলে ঢিল ছুঁড়ছে। দূর থেকে ছেলেকে দেখে শ্বেতার আজ যেন চমক লাগল। মাতাল স্বামীর খেয়ালের ভেতর দিয়ে বিধাতা যদি অমন অনুকম্পাই করলেন, ওই সঙ্গে অনন্ত তৃষ্ণার অন্ত করে এই অনন্তকেও ভুলিয়ে দিলেন না কেন? তার ওই নাড়ী-ছেঁড়া ধনের সাতবছরব্যাপী প্রভাব ও আত্মমর্য্যাদার শিক্ষা কত সহজে ব্যর্থ করে দিচ্ছে এই একান্ত পর মানুষটি! হায়, একি বিড়ম্বনা!

কুণাল মুখ তুলে চেয়ে জানালায় মাকে দেখে হাসল। শ্বেতার ইচ্ছা হল কপালে কঙ্কণহীন করাঘাত করে কেঁদে ওঠে!

অথচ জীবন যে রঙীন হয়ে উঠেছে বুঝতে কেবল প্রথম ধাক্কাটি সামলে ওঠারই বাধাই ছিল। দশবছর ধরে প্রেমিক ব্যথার পূজায় তাকেই নন্দিত করেছে, এর গর্ব্ব আর আনন্দ কোন নারীই কি অস্বীকার করতে পারে! জীবনের একমাত্র পার্থিব প্রেমই সব যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের প্রতিকূলেও দিনগুলি অবর্ণনীয় মাধুর্য্যে ভরে দেবার শক্তি রাখে বৈকি!

সমবয়সী মাসী হিমানী বলে, 'তোর চোখ দেখে মনে হয় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস। ক'দিন ধরে দেখছি রাতজাগা রোগেও ধরেছে।'

শ্বেতা হেসে বলে, 'কবিতা লেখা অভ্যাস করছি। একটা অবলম্বন চাইতো মাসী!'

মাসী গম্ভীর হয়ে বলে, 'কাব্য অবলম্বন করে পাড়ি জমাতে পারবি এমন আশা ভুলেও করিস না।'

'আশা কিছুরই করিনা মাসী!' বলে শ্বেতা মাসীর কাছ থেকে প্রস্থান

করে। মাসী কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়, শ্বেতাকে খুঁজে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে :

'আমার খোকাকে একেবারে ত্যাগ করেছিস যে কদিন ?'

'আমার কাছে ও থাকতে চায় না,—কাঁদে।'

'কাল কিন্তু তোর কাছে যাবার জন্যই কাঁদছিল'—বলে মাসী শ্বেতার মুখখানি ভাল করে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেন।

শ্বেতা ব্যগ্রতা দেখিয়ে বলে, 'সত্যি মাসী ? তবেতো এক্ষুনি ওকে আমার বড্ড দরকার !'

মাসীর খোকাকে খুঁজে নিয়ে শ্বেতা এমনি আদর আরম্ভ করে যে খোকা বেচারী কেঁদেই আকুল ! খোকার কান্নায় খুসী হয়ে শ্বেতা বলে, 'দেখলে মাসী ? সাধে কি নিইনা ওকে !'

'যে আদরই তুই করিস্ ! একবেলা হবিষ্যি করে এত স্ফূর্ত্তি তোর কোথা থেকে আসে তাই ভাবি।'

বোনঝির মধ্যে কি একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি হিমানীর চোখে পড়ে, তাই এরকম একটা সূক্ষ্ম খোঁচা না দিয়ে সে থাকতে পারে না। শ্বেতা মনে মনে রাগ করে,মাসীর এই অনধিকার চর্চ্চার কারণ সে খুজে পায় না। রাতভোর স্বামীর সোহাগ ভোগ করে ভোরবেলা ও বিধবা বোনঝিকে খোঁচাতে আসে কেন !

শেষে শ্বেতার মন যায় খারাপ হয়ে। পশ্চিমের খোলা বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে সে স্কুলের টিনের চালাটার দিকে চেয়ে থাকে। হেডমাষ্টারের বাড়ী স্কুলের ওদিকে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। শ্বেতা ভাবতে থাকে, নির্জ্জন গৃহে নিঃসঙ্গ অনন্ত কি করছে।

হিমানীর ছেলের কান্না, কুণালের চীৎকার করে পাঠাভ্যাস, নীচে ঝি চাকরের কলরব সমস্ত তার কাছে হঠাৎ মিথ্যা হয়ে যায়, চারিদিকে ঘর

বাড়ী মাঠের বুকে সকালবেলার তাপহীন উজ্জ্বল রৌদ্রের ব্যাপ্তি, খানিকদূরে শিরীষ গাছের শাখায় কয়েকটা শকুনির নিস্পন্দ অবস্থান, ঘোষেদের বাড়ীর সামনের কাঁচা পথ দিয়ে মানুষের আনাগোনা, সমস্তই তার কাছে কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে, মনে হয় দুবেলা দেখেও তার এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে সে চিনতে পারেনি ; এতদিন যা নিত্যকার দেখায় তুচ্ছ হয়ে ছিল, আজ তাদের মধ্যে অজস্র মানে, অতিরিক্ত মানে আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

স্কুল থেকে এসেই কুণাল সুরু করে দেয়, 'জান মা, হেডমাষ্টার মশাই আমাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে কতো আদর করলেন।'

'কি আদর করলেন ?'

'এই চুমু খেলেন।'

'কোথায় চুমু খেলেন রে খোকা ? গালে ?'

'হুঁ।'

শ্বেতা ছেলের দু'টি গালই চুম্বনে ভরে দেয়, বলে, 'কার চুমু তোর বেশী ভাল লাগে বলত ?'

কুণাল সলজ্জে বলে, 'তোমার। হেডমাষ্টার মশাইএর মুখে যা দাড়ি।'

শ্বেতা নিঃশব্দে হাসে।

কুণাল নিজের মনে বলে, 'ওঁর ঘরে তোমার একটা ছবি আছে মা। লাল পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। আমি পর্দ্দা তুলে দেখে ফেললাম বলে বল্লেন, তুমি ভারি দুষ্টু খোকা। এমন মজা মা, ফুল দিয়ে তুমি অর্দ্ধেক ঢেকে গেছ।'

'সত্যি খোকা ?' শ্বেতার চোখ হঠাৎ ছল ছল করে আসে। এ সেই ছবি, ন'বছর আগে শেষ বিদায়ের দিন অনন্ত যেটা ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল। কায়ার প্রত্যাখ্যানে অনন্ত তবে নটি' বছর ছায়া নিয়ে কাটিয়েছে। হায়, মানুষটার জীবনে একি বিড়ম্বনা !

নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়, অকিঞ্চিৎকর। কুণালের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে শ্বেতা ভাবতে থাকে, বিনা তপস্যায় এত বড় সম্পদ তার জুটল কি করে ?

শিবরাম এসে বললেন, 'জানিস্ মা, আমাদের হেডমাষ্টারটি বড় দুঃখী।'

এ যেন জানা নেই এমনি ভাব দেখিয়ে শ্বেতা বলল, 'কেন বাবা ? ওঁর দুঃখ কি ?'

শিবরাম গম্ভীর মুখে বললেন, 'সংসারে আপনার কেউ নেই, দেওয়ানা ফকিরের মত ঘুরে বেড়ায়, দুঃখী বৈকি ! বল্লে ন'বছর আগে ওর বৌ হারিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে'

'বৌ হারিয়ে গিয়েছিল ? ওঃ !'

অনন্তের এই রূপকের চমৎকারিত্বে শ্বেতার মন পুলকিত হয়ে উঠল। নিজের ঘরে গিয়ে সে নিজের মনেই আবৃত্তি করে চলল, 'বৌ হারিয়ে গিয়েছিল ! বৌ ! আজ আবার সেই হারানো বৌকে পাওয়া গেছে। হারিয়েছিল তরুণী বৌ, ফিরেছে ছাব্বিশ বছরের বুড়ী !'

যে আজ মন্ত্রেরও বড় ঈশ্বরের বিধান মেনে বৌ হতে ভয় পায়না !

সকাল থেকে শ্বেতা আজ আনমনা হয়ে ছিল। সেদিন শমনজারি করে গিয়ে অনন্ত আর আসেনি বটে, আজ কিন্তু সে নীলামের দাবী নিয়ে আসবে। আগামী অভিসারের কল্পনাতেই দিনের আলোয় শ্বেতার গালে রক্ত খেলা করে যাচ্ছিল। বুকের মধ্যে এখন থেকেই-অনেক কিছুই যেন উত্তেজনায় ক্ষেপে উঠেছে। তারই প্রতিক্রিয়াই সারা দেহে এমনি অবসাদ যে কোন কাজেই প্রবৃত্তি নেই।

ঝিকে দিয়ে নিজের ঘরখানা ধুয়ে মুছে রাখবে বলে খোঁজ নিয়ে শ্বেতা জানল, ঝি কোথায় যেন গেছে। বাড়ীতে ঝি চাকরের অভাব নেই, ঘর

ধোয়ার কাজে কোন বাধা হলনা, কিন্তু দরকারের সময় নিজস্ব ঝিকে না পেয়ে শ্বেতা তার ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়েই রইল।

ঝি ফিরিতেই বলল, 'কোন চুলোয় গিযেছিলি রাথীর মা ?'

ঝি বলল, 'চুলোয় যাব কি জন্যে দিদি ? হেডমাষ্টারের বাড়ী গিয়েছিলাম। মাগো কি কাণ্ডটাই হ'ল !'

কৌতূহলী হয়ে শ্বেতা বলল, 'কি কাণ্ডরে ?'

'শোন বলি। রাথীর বাপের কাল জ্বর। আমায় বললে, কাজে তো যেতে পারব না রাথীর মা, সকালে একবার গিয়ে বাসনগুলো মেজে দিযে আসিস। কি করি, গেনু বাসন মাজতে হেডমাষ্টারের বাড়ী। বাসন টাসন মেজে তো দিদি আমি চলে আসব, গট্‌গট্‌ করে বাড়ীর ভেতর ঢুকল এক ফিরিঙ্গী খেস্তান মেমসায়েব।'

'মেমসাহেব ?'

'খাঁটি মেম নয় গো, দিশী। কিন্তু কি রূপ দিদি, আহা ! মা দুগ্‌গো যেন ফিরিঙ্গী মেযে হযে এলেন। পাযে জুতো মোজা, ঘাঘরাব মত শাড়ী পরা, গলায় লিক্‌লিকে সরু হার। হেডমাষ্টার তো ঘর থেকে বেবিয়ে ভিরমি যাবার যো ! হেঁকে বললে, তুমি কোথা থেকে এলে নীনা ? তোমায না আসতে বারণ করেছিলাম ? মেযেটা তার জবাবে বললে, তোমাব কাছে না এসে কোথায় যাবো ? তুমি আমায ফেলে এলে কেন ? তাবপর বিনিয়ে বিনিযে যা বললে দিদিমণি তাতে বুঝলাম মেযেটা আমাদেব মাষ্টারের বৌ।'

'কি বললে ?'

'বললে, 'আমি তোমার ইস্তিরী তোমায় আমি ছাড়ব কেন ? পিথিমীর শেষ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে ঘুরবো আমি।'

'তারপর ?'

'তারপর দু'জনায় বিষোম ঝগড়া সুরু হ'ল। ভয়ে মরি খুনোখুনিই বা হয়। মাষ্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, এই বদ্‌স্বভাবের জন্য তোমায় আমি দেখতে পারিনা নীলা। যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন? মেয়েটা বললে, আমার কি দোষ? তোমার কাছে আমি কোন অপরাধ করিনি। মাষ্টার তাতে আরও চেঁচিয়ে বললে, আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরী হয়েছ, এই দোষ। যাও যাও চলে যাও তুমি। শুনে মুখে ন্যাকড়া গুঁজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মাষ্টার আর কিছু না বলে গুম্ হয়ে দাওয়ায় বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে বললে, কেঁদোনা নীলা, এদিকে এসো। তারপর আমায় বললে, তুমি যাও ঝি। আমার কি চলে আসতে পা ওঠে? কিন্তু কি করি—'

লাটিমের মত সারা বাড়ীতে শ্বেতা একা পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল, ভিতরের অস্থিরতার সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য রেখে যতটুকু স্বস্তি মেলে। কিন্তু স্বস্তি তার কাছে চিরদিনের জন্যই দুর্লভ হয়ে গেছে।

পাকা খবর পাওয়া গেল শিবরামের কাছে। প্রাতর্ভ্রমণের পর ফেরার পথে আজও তিনি হেডমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন।

বললেন, 'জানিস শ্বেতা আমাদের হেডমাষ্টারের কাণ্ড? ওর বৌ হারানোর কথা টথা সব মিথ্যে। এই বুড়োর সঙ্গে সে দিন একটু ইয়ার্কি দিয়েছিল। বুঝলি।'

শ্বেতা নীরব।

'ওর বৌ আজ এসেছে।'

শ্বেতা তবু নীরব।

শিবরাম কন্যার মন্তব্যের জন্য খানিক অপেক্ষা করে বললেন, 'মানুষটা অতি বদ, অতি বেহায়া। নিজে থেকেই বললে, একটা প্রণয় কাণ্ডের

নায়ক হয়ে ছিলাম গাঙ্গুলি মশাই। শ্বশুর আর শালারা জেলে দেবার ভয় দেখিয়ে—'

শ্বেতা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আমি সব শুনেছি বাবা। ওকে তুমি তাড়িয়ে দাও।' শিবরাম ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'তাড়াতে হবে না মা, ও নিজেই চলে যাচ্ছে। এদিকে স্কুলটার উন্নতি হচ্ছিল বেশ, অমন কাজের লোক কি আর পাওয়া যাবে!'

শ্বেতা শিবরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যাবে বাবা, ওর চেয়ে ভাল লোক পাওয়া যাবে। আমি তোমায় বলছি ও যা কাজ করেছে সব লোকদেখানো, সব ভান, সব অভিনয়—'

রকমারি

বাড়ীতে পা দিতেই গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠে কাণে আসিল। বেড়াইয়া ফিরিতেছিলাম, মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল। ভাবিলাম, প্রফুল্লতাটুকু বুঝি চৌকাঠের বাহিরেই রাখিয়া যাইতে হয়।

ভিতরে আর ঢুকিলাম না। বৈঠকখানা ঘরটা অন্ধকার, ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিলাম। সুইচটা টিপিয়া দিতে গিয়া হাত গুটাইয়া নিলাম। আলো জ্বালিলেই খবর পৌছিবে। গৃহিণীর মুখের অন্ধকারের চেয়ে বাহিরের ঘরের অন্ধকারটা নিরাপদ মনে হইল।

জামাটা খুলিয়া চেয়ারের উপর ফেলিয়া রাখিয়া চৌকীর উপর বিছানো ফরাসে গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম।

পরিচিত কণ্ঠস্বর গ্রামে গ্রামে চড়িতে লাগিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, ততোধিক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ; কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে প্রযোগ হইতেছে বুঝিতে দেরী হইল না। সামনাসামনি কি রকম বিঁধিতেছিল ভগবানই জানেন, এতদূরে আসিয়া কিন্তু সব্যসাচীর অবর্থ্য সন্ধানের দুর্ভাগ্য লক্ষ্যের মত আমাকে বিঁধিতে লাগিল। একটা মোটা গলা সক্রোধে গর্জ্জিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, পরক্ষণে থামিয়া যাইতেছিল। প্রলয় গণিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে স্বর নামিতে লাগিল। নামিতে নামিতে শেষে একেবারেই থামিয়া গেল। বুঝিলাম, অপর জন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে।

পরক্ষণে পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আমায় দেখিতে না পাইয়া খুব কাছেই বসিয়া পড়িল। বুঝিলাম কাঁদিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমারই এক এক সময় কাঁদিতে ইচ্ছা করে ও তো চাকর।

প্রশ্ন করিলাম, 'কি হয়েছে রে, হরে?'

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, একহাত দূরে আমার সাড়া পাইয়া হরিচরণ সেই রকম চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দেখতে পাইনি বাবু—'

বলিলাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাতে আর কি হয়েছে। তোকে বকছিলেন কেন রে?'

হরিচরণ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই। আজ সকালে গৃহিণী তাহাকে শয়ন গৃহের দেওয়াল ঝাড়িতে আদেশ করেন। বাজার হইতে ফিরিয়া কাযটা করিবে ভাবিয়া সে বাজারে চলিয়া যায়। তারপর আলুপটলের হিসাবের গোলমালে কথাটা বেমালুম তার মন হইতে সরিয়া পড়ে। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ ঘরের কোণে মাকড়সার জাল নজরে পড়ায় গৃহিণীর মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া যায় এবং হরিচরণের উপর তৎ-ক্ষণাৎ দেওয়াল ঝাড়িবার আদেশ জারি হয়। সে যত বলে, কাল করব মা, গৃহিণী ততই উষ্ণ হইতে থাকেন। অগত্যা হরিচরণ সেই ভর সন্ধ্যে-বেলা দেওয়াল ঝাড়িতে আরম্ভ করে। হঠাৎ নিতান্তই তার কপাল দোষে, ঝাড়নে লাগিয়া একখানা ছবি পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। সেই হইতে বর্ষণ সুরু হইয়াছে। গৃহিণীর নাকি অভিমত—কাজ করিতে বলায় রাগে সে ইচ্ছা করিয়া ভাঙিয়াছে। নহিলে, সে কি চোখের মাথা খাইয়াছে যে অতবড় একটা জিনিস দেখিতে পায় না?

'আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি বাবু? মা তো বুঝলেন না, কেবল

বকুনি দিতে লাগলেন। এত কথা সয়ে থাকতে পারব না, কাল সকালে আমায় মাইনে দিয়ে বিদায় দেবেন।'—বলিয়া উপসংহার করিল।

দরজার কাছে চড়া গলা শোনা গেল, 'কার কাছে মানের কান্না কাঁদছিস রে হরে?'

কাঠ হইয়া গেলাম। চাকরকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি দুঃখের কাহিনী অর্থাৎ গৃহিণীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিতেছি, ইহার চেয়ে বড় অপরাধ আমাদের দাম্পত্য পেনাল কোডে লেখে না।

ঘরে ঢুকিয়া থপ করিয়া সুইচটা টিপিয়া দিলেন। আমার দিকে বারেক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'বেড়িয়ে এসে চাকরের মুখে আমার নিন্দেটা বড় মুখরোচক লাগছে, না?' বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হাসিটা ভয়ানক! শুদ্ধ রাগ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু হাসির আড়ালের রাগটা বড় বেগাড়া, কিছুতেই বাগ মানিতে চাহে না।

হরিচরণ কথা কহিল না। তার ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া সটান শয়ন করিল। উঠিলাম,—বসিয়া লাভ নাই। চেয়ারের উপর হইতে জামাটা টানিতেই একটা চায়ের কাপ জামার তল হইতে পড়িয়া তিন টুকরা বড় এবং বহু ক্ষুদ্র টুকরাতে বিভক্ত হইয়া গেল। জামায় তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলাকার দাগ। ববাদ্দ দুই কাপের উপর তৃষ্ণা পাওয়ায় দোকান হইতে এক কাপ চা আনাইয়া চুপি চুপি এখানে বসিয়া খাইয়াছিলাম। কাপটা আমিই চেয়ারের উপরেই নামাইয়া রাখিয়াছিলাম। অপকর্ম্মের অতবড় নীরব সাক্ষীটাকে সরাইয়া ফেলিবার মত বুদ্ধি ঘটে ছিল না। হায় রে, সেই কিনা আমায় ফাসাইল। জামার এ অবস্থা দেখিলে—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলিয়া একটা কথা আছে না?

আলমারি খুলিয়া মোটা মোটা আইনের বইয়ের পিছনে জামাটা লুকাইলাম, ভাবিলাম কাল সকালে ডাইং ক্লিনিংএ পাঠাইয়া দিব। উপরে

গিযা শযন গৃহে ঢুকিতেই নজবে পড়িল খাটেব উপব পা ছড়াইয়া বসিযা তিনি আমাব একুশ টাকা দামের ফাউন্টেন পেনটি লইযা একটা কাগজে খস খস কবিযা কি লিখিতেছেন। পাযেব শব্দে নজব তুলিলেন। বলিলেন, ‘খালি গাযে? জামা কি হল? বিলিযে দিযে এলে নাকি?’ ব্যস, ডাইংকিনিং খতম। নিজেব উপব চটিযা গেলাম। অন্য একটা জামা গাযে দিযা এ ঘবে ঢুকিলেই হইত। এই কার্ত্তিকেব শেষে স্বামীব খালি গা দেখিযা কোন সুগৃহিণীব না জামাব কথাটা মনে জাগে। ওকালতী কবিযা বাহিবেব লোকেব আন্দাজ মতে মাসে তেবো চৌদ্দ শ, নিজেব হিসাবমত সাত আটশো টাকা বোজগাব কবি, আব এইটুকু বুদ্ধি মাথায আসিল না? ধিক। বলিলাম, ‘বাইবেব ঘবে ফেলে এসেছি, নিযে আসছি।’ বলিযা তাড়াতাড়ি পা বাড়াইলাম। আলমাবীব বইযেব পিছনেব গোপনতাটুকু গোপন কবাই শ্রেযঃ।

গৃহিণী বলিলেন, ‘থাক থাক, তুমি বসো। ঝিকে দিযে আনিযে নিচ্ছি। তুমি ঐ ফ্যালানেব শার্টটা গাযে দাও।’

কপাল। বাহিবেব ঘবেব সেই জাতীয সাংঘাতিক হাসি হাসিযা পূর্ব্বে ববাবব একটা গোটা বাত কথা বন্ধ কবিযা আসিযাছেন। আব যেদিন জামায চাযেব দাগ লাগিল এবং একটা হাস্যকব যাযগায সেটা লুকাইযা বাখিলাম, সেই দিনই তিনি এমন সদয হইযা পড়িলেন। ঝিকে ডাকিলেন এবং জামা আনিতে পাঠাইলেন। একটু সবিযা বসিযা নিজেব পাশে খাটেব উপবকার যাযগাটা দেখাইযা বলিলেন, ‘এইখানে বসো, একটা কায আছে। আগে শার্টটা গাযে দিযে নাও। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, তোমাব আবাব যে সর্দ্দিব ধাত!’

ওঃ! কায আছে তাই! প্রযোজনেব খাতিবে অমন হাসিটাকে নিরর্থক হইতে দিবার উদাবতা গৃহিণীর ছিল।

জামাটা গায়ে দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। বলিলেন, 'মৃণালিনীকে চেন তো?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'চিনি।'

'কে বলতো?'

'বঙ্কিম বাবুর মানস কন্যা, এবং—'

'এবং তোমার প্রণয়িনী।'—

আমি বলিলাম, 'থুঃ, ওয়াক্!'

গৃহিণী বলিলেন, 'তাই নাকি! বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম। ঠাট্টা এখন থাক, কাজের কথা শোনো! এ তোমার সে মৃণালিনী নয়, আমার সই। ধীরেন বাবুর স্ত্রী গো! মনে নেই?'

মনে ছিল কিন্তু বলিলাম, 'উঁহু, মনে ত পড়ছে না।'

তিনি বলিলেন, 'থাক্ থাক্ অত সাধু বনতে হবে না। যার গান শুনে ধীরেন বাবুর সঙ্গে স্ত্রী বদল করতে চেয়েছিলে তার কথা তিন্ মাসেই ভুলেছ বটে!'

সর্ব্বনাশ! ধীরেনের কাণে কাণে বলা সেই পরিহাসটুকুও শুনিতে বাকী নাই!

বলিলেন 'এখন শোনো। সই ভারি একটা মজা করেছে। আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছে, ইংরিজিতে। একটা ভাল রকম জবাব লিখেছি, কারেক্ট করে দাও দেখি। বুদ্ধি তোমার যদিও কম, এম-এ বি-এলটা তো পাশ করেছ, পারা উচিত। ভুল থাকলে কিন্তু ধীরেন বাবু হাসবেন!'

বলিলাম 'মজুরি?'

'অগ্রিম চাই?'

'নিশ্চয়ই। যদি ফাঁকি দাও।'

কণ্ঠস্বর সে কণ্ঠেই বাস করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নহিলে, ওষ্ঠে বাস করিলে গৃহিণীর এই পঁচিশ বৎসর বয়সের অধর সুধাই ঝাল লাগিত এবং ওষ্ঠ জ্বলিত।

বাহির হইতে ঝি বলিল, 'বাইরের ঘরে বাবুর জামা ত পেলুম না মা।' গৃহিণী আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, 'সদর দরজা বন্ধ ছিল দেখে এসেছিস?'

ঝি বলিল, 'নজর করিনি মা।'

'নজর করিসনি। ঘরে গেলি, একটা জামা খুঁজলি, আর তোর নজরে পড়লো না সদর দরজা খোলা কি বন্ধ। চোখ চেয়ে কায করিস? না, কায করবার সময় স্বপ্ন দেখিস? অবাক করলি বাছা। যা দেখে আয়।'

ঝি চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সদর দরজা খোলাই ছিল।

'বেশ। সেদিন এতটাকা খরচ ক'রে এমন সুন্দর শাদা ভাগেলার পাঞ্জাবীটা করিয়ে দিলুম, যাবেই তো।'

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, 'আমি একবার দেখে আসি।' বলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। আইনের কেতাবের পিছন হইতে জামাটা টানিতেই, খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই বোধ হয়, কোথায় একটা পেরেক লুকাইয়া ছিল, জামা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। উহা লইয়াই উপরে গেলাম।

ঝি আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী বলিলেন, 'জামা যে পেলিনে, এটা কি?'

'দেখতে পাইনি মা।'

'তা দেখতে পাবি কেন! এমন ব্যাগাব ঠ্যালা কায কবিস কেন বল্‌তো? এটা কি ছুঁচ না আলপিন যে কোথায লুকিযে ছিল খুঁজে পাসনি?'

ঝি চুপ কবিযা বহিল।

গৃহিণী আবও কি বলিতে যাইতেছিলেন, ঝিব দিকে চাহিযা হঠাৎ বলিলেন, 'তুই কাঁপছিস কেন বে?'

'শবীবটা ভাল লাগছে নেই মা।'

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আগাইযা গিযা তাব কপালে হাত দিলেন। বলিলেন, 'ইস, তাইতো। বেশ জ্বব হযেছে যে। আচ্ছা তুই কি বকম মানুষ বলতো ঝি? জ্বব গাযে কে তোকে কায কবতে বলেছে? সন্ধ্যে বেলা অতগুলো বাসন মাজলি তুই কোন আক্কেলে শুনি? একটা বাড়াবাড়ি অসুখ বাধিযে আমায দশটা টাকা খবচ কবাবাব মতলব, না? যা যা শুযে পড়গে যা। অবাক মানুষ তুই বাছা।'

ঝি বলিল, 'ঠাইটা কবে দিযে শুচ্ছি মা।'

'ফেব মুখেব ওপব কথা বলে। কাল যদি তোকে দূব না কবি তো— ভাল চাস তো শুযে পড়গে যা বাছা। কেন বকছিস, অসুখটা বাড়লে হাঙ্গামা তো আমাকেই পোযাতে হবে।'

ঝি আব কথাটি না কবিযা চলিযা গেল।

গৃহিণী একটু দাঁড়াইযা থাকিযা বলিলেন, 'দেখিগে শুলো কিনা। যে সব তোমাব ঝি চাকব। একটা যদি কথা শোনে?' বলিযা চলিযা গেলেন।

ফিবিযা আসিযা আমাব জামাটা লইযা আলনায টাঙাইতে গিযা গৃহিণী সেই দাগ ও ছেঁড়া দেখিতে পাইযা বজ্রগর্ভ দৃষ্টিতে আমাব পানে চাহিলেন।

দাগ ও ছেঁড়াব একটা কাল্পনিক ইতিহাস আরম্ভ করিযাছিলাম,—'ওটা হযেছিল কি জান?—এই গিযে—'

সময় সৌভাগ্যক্রমে নীচে বন্ধু নীরদবরণের কণ্ঠ শুনিলাম, 'ওহে—ঘুমুলে নাকি?'

'নীরু এসেছে। কি বলছে শুনে আসি।'—বলিযা আমি চম্পট প্রদান করিলাম।

নযটাব সময বন্ধুকে বিদায দিযা, দুর্গানাম জপ করিতে করিতে উপবে গিযা দেখি, গৃহিণী একমনে একখানি চিঠি পড়িতেছেন। মুখের মেঘ কাটিযা গিযাছে।

নয়টার সময আহাব শেষ করিযা আবার নীচে নামিলাম। আফিস ঘরে ঢুকিযা মোকদ্দমার কাগজপত্র লইযা বসিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল আমাব জ্যেষ্ঠ শ্যালকের তিনদিন হইল পত্র আসিযাছে। পত্রে বহুদিন আমার কোন পত্র না লেখাব জন্য অনুযোগ আছে এবং গৃহিণীও সে পত্রখানা পড়িযাছেন। তৎক্ষণাৎ কাগজ লইযা পত্র লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ করিযা খামে ভরিযা ঠিকানা লিখিতেছি, গৃহিণীব গলা কাণে গেল, 'ভাল চাস তো উঠে আয হবে, আমাকে বাগাস নে বলে দিচ্চি! খাবি না তো তুই বিকেলে বল্লি না কেন? অত ভাত নষ্ট হবে?'

হরেব জবাব শোনা গেল, 'আমার অসুখ হযেছে, আমি খাব না।

গৃহিণী বলিলেন, 'সে সব আমি জানি। চাকবী করতে এসে ভাতেব ওপর রাগ করিস তোর লজ্জা করেনা হারামজাদা? উঠে আয বলছি!'

হবে বলিল, 'আমি খাব না।'

গৃহিণী, 'বেশ!' বলিযা স্থান ত্যাগ করিলেন এবং আমার আপিস ঘরে ঢুকিয়া একটা চেযারে বসিযা পড়িলেন।

ঠিকানার উপরে ব্লটিং চাপা দিয়া বলিলাম, 'খাওযা হয়েছে তোমার?'

'হুঁ।'

'হরে বুঝি খেলে না ?'

ঝঙ্কার দিলেন, 'শুনতে পাওনা ? এতক্ষণ ধরে সাধছিলাম কাকে ?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কথা বলাটা নিরাপদ নয়।

কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তুমি একবার হরেকে বল গে না!'

'আমি ? তুমি বলতে খেলে না, আর আমার কথা শুনবে ?'

চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, 'মরুক, নিজেই খিদের জ্বালায় জ্বলবে। একটা চাকব, তাকে আবার খোসামোদ করে খাওযাতে হবে, ভারি ত! চল শোবে, বাত হল।'

'চল,' বলিযা তিনি উঠিযা দাঁড়াইলেন।

শযন ঘবে ঢুকিযা বলিলেন, 'আচ্ছা একটা শেষ ধর্ম্মের ডাক দিযে আসি। একটা লোক না খেযে থাকবে তাই, নইলে—' কথাটা শেষ না কবিযাই তিনি চলিযা গেলেন। আমি একটু হাসিযা বারান্দায বেলিঙের কাছে দাঁড়াইলাম।

গৃহিণীব শান্ত গলা শোনা গেল, 'হরে, লক্ষী বাবা! উঠে এসে খেযে নে। মিথ্যে জ্বালাস কেন বল দেখি ?'

'আমাব খিদে, নেই, খাবনা মা।'

'হরে!'—কণ্ঠস্বব ঠিক কোন্ গ্রামের বলা শক্ত! কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ। এবং ভৎ´সনা, ক্রোধ, সান্ত্বনা ইত্যাদি এতগুলি ভাব. লইযা ঐ একটি কথা উচ্চাবিত হইল যে শুনিলে অবাক হইতে হয।

হরিচবণ আর দ্বিরুক্তি না কবিযা উঠিযা আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, 'রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে, খেযে দরজা বন্ধ করে শুযে পড়। কাল সকালে মাইনে নিয়ে তুমি বাবু বিদেয হোয়ো। তোমাকে

দিয়ে আমার পোষাবে না।' বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। নীচের বারান্দায় আলোতে দেখিলাম হরিচরণ নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

তিনি উপরে উঠিবার আগেই আমি ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিলাম। তিনি আসিলে বলিলাম, 'খেলে ?'

দরজায় খিল দিতে দিতে বলিলেন, 'হুঁ, খাবেনা আবার। কাল কিন্তু ওকে দূর করবো।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো।'

পাশে বসিয়া বলিলেন, 'চিঠিটা কারেক্ট করেছ ? কাল সকালের ডাকে যাওয়া চাই কিন্তু।'

বলিলাম, 'না।'

'কেন ? সময় হল না বুঝি ?'

গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'তুমি না ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে ? না, বিয়ের সময় ঐ কথা বলে আমাদের ঠকান হয়েছিল ? ম্যাট্রিক পাশ করেছ আর শুদ্ধ করে ইংরাজীতে একখানা চিঠি লিখতে পার না ?"'

'কে বল্লে পারি না ? তবে, হঠাৎ যদি ভুল থাকে, চর্চ্চা তো নেই ! তাই তোমায় অনুরোধটা জানিয়েছিলুম—তা ঘাট হয়েছে। বিয়ের সময় তোমার মামা না কে পূরো আধঘণ্টা ধরে ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট খানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন, মনে নেই ?'

আমি হাসিয়া তাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, 'তাই নাকি ! তবে তো কথাই নেই। আচ্ছা দেবো কাল কারেক্ট করে।'

আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আবার কাল ! তোমায় একটা কায করতে বল্লেই দশটা ওজোর কর। বেশী রাত হয়নি, পাঁচ মিনিটও লাগবে না, দাওনা লক্ষীটি এখুনি। কাল সকালের ডাকে পাঠিয়ে দেবো।'

আদেশ প্রতিপালন করিলাম।

পরদিন প্রাতে হরে আসিয়া বেতন ও বিদায় চাহিলে গৃহিণী তাহাকে শুধু মারিতে বাকী রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া দেখি আমার সেই চায়ের দাগ ধরা নূতন ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবীটা হরে গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। ছেঁড়া অংশটুকু গৃহিণী সেলাই করিয়া তাহাকে দিয়াছেন।

কবি ও ভাস্করের লড়াই

প্রতিভার প্রতি চারণী দেবীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। রূপ কাকে বলে জানার পর থেকেই সে জানত এ তার মন উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। অল্প বয়স থেকে এই ধরণের একটা জ্ঞান মনের মধ্যে পুষে রাখার ফলে চারণীর ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে একটি বিশেষ বৃহৎ প্রতিভাকে বৃহত্তর প্রতিভায় পরিবর্ত্তিত করার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছে ; তার নারী-জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা সন্তান-পালনের মত প্রতিভার প্রতিপালনে। অবিকল এই উদ্দেশ্যের উপযুক্ত করে চারণী নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর অথবা নিছক গদ্য-সাহিত্যিক ঠিক কোন ধরণের প্রতিভার বিকাশের ভারটা তাকে গ্রহণ করতে হবে জানা না থাকায়, সব দিক বজায় রাখার জন্য, এই চার রকম প্রতিভার উপযুক্ত করেই নিজেকে সে তৈরী করেছিল। স্কুল কলেজে এরকম ব্যাপক ও অবাস্তব শিক্ষার ব্যবস্থা নেই ; স্কুল কলেজ প্রতিভাকে মানে না। স্কুল ছাড়িয়ে চারণী তাই আর কলেজে ঢোকে নি। বাড়ীতে নিজেরই তত্ত্বাবধানে সে চারটি ক্লাস করত। সকালে কবিতার, দুপুরে ছবি ও খোদাই-এর, রাত্রে গদ্য সাহিত্যের।

এমনি ভাবে পুস্তক ও এ্যালবামের মধ্যস্থতায় চারণী জগতের বড় প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল কিন্তু রক্ত-মাংসের প্রতিভার খোঁজ সে পেলে না। দু'চারজন কবি শিল্পী ও সাহিত্যিক যাদের সঙ্গে তার আলাপ হ'ল তারা এত গরীব যে তাদের প্রতিভাকে চারণী মেনে নিতে পারলে না। তা ছাড়া, এরকম প্রতিভার বিকাশের ভার নেবার সাধ চারণীর কোন দিনই ছিল না। টাকা পয়সার গোলমাল সে অত্যন্ত

অপছন্দ করত। প্রতিভার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সে সর্ব্বদাই রাজী ছিল কিন্তু আজ আনো আজ খাও কালকে উপোস দাও যে প্রতিভা তার জন্য দু'চার ঘণ্টা সময় ও দুচার কাপ চায়ের বেশী আর কিছু উৎসর্গ করা তার কাছে ছিল নষ্ট করার সামিল। জীবন অমূল্য। দুটো পাঁচটা ফালতু জীবনও মানুষের থাকে না যে নষ্ট করা চলে। চারণী তাই তার পরিচিত গরীব প্রতিভাগুলির পাশ কাটিয়ে চলত। সুতরাং পাশে পাশে চলবার মত প্রতিভাও সে আবিষ্কার করতে পারত না।

বেড়ে বেড়ে চারণীর বয়স যখন হল একুশ এবং তার ক্ষীণ আর্টিষ্টিক দেহটি একটু স্থূল হয়ে উঠবার উপক্রম করলে তখন ভয় পেয়ে ও হতাশ হ'য়ে প্রতিভা-চিনির বোঝাবাহী এক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া সে প্রায় স্থির করে ফেললে। এমন সময় প্রায় এক সঙ্গে দুজন ধনবান রূপবান বলবান প্রতিভার আবির্ভাবে চারণীর জীবনে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল। প্রথম এল অরবিন্দ—উদীয়মান ভাস্কর। তাবপর, অরবিন্দের সঙ্গে চারণীর বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে এসেছে, তখন এল মহাব্রত,—উদীয়মান কবি।

দুজনেই প্রতিভা। মরবার আগে সাগর পারে দু'চার জন ভক্ত না রেখে ওরা কেউ মরবে না, এটুকু নিঃসন্দেহ। চারণীর ভারি বিপদ হল। দুটি প্রতিভা-স্রোতের সম্পর্কে যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি হল তাতে পাক খেয়ে খেয়ে তার মাথা এমনি গুলিয়ে গেল যে সে কোন মতেই ঠিক করে উঠতে পারলে না কোন স্রোতে ভেসে যাবে। আসলে চারণীর একেবারেই মনের জোর ছিল না। যখন যে প্রতিভাটি তার কাছে থাকত তার মনে হত তাকেই সে ভালবাসে। দুজনের দুরকম কিন্তু প্রায় সমান জোরালো ব্যক্তিত্ব দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার তাকে পেণ্ডুলামের মত এদিক ওদিক দোলাত আর বাকী সময়টা দুজনের সমান আকর্ষণ অনুভব করে তার মনে

হত নিজেকে চুলচেরা দুভাগে ভাগ না করে ফেললে এ টানাটানি সমস্যার আর মীমাংসা নেই।

আগে এসেছিল বলে অরবিন্দের কিছু কিছু দখলী স্বত্ব জন্মেছিল কিন্তু মহাব্রত এক রকম কথা বলেই তা বাতিল করে দিলে। এদিক দিয়ে অরবিন্দের চেয়ে সে ছিল বেশী শক্তিমান। আশ্চর্য্য ছিল তার কথা বলার ক্ষমতা। তার বক্তব্য রূপ নিত বক্তৃতার এবং তাতে যেখানে অখণ্ডনীয় যুক্তি থাকত না সেখানে থাকত বেগবতী আবেগ, আর যেখানে বেগবতী আবেগ থাকত না সেখানে থাকত অখণ্ডনীয় যুক্তি। দশ মিনিট তার কথা শুনে চারণী ভেসে যেত। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না যে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা এই বিস্ময়কর মুখর কবি-প্রতিভাকে সন্তানের মত প্রতিপালন করা। মহাব্রত চলে যাবার পর অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটা পর্য্যন্ত চারণী উত্তেজিত হয়ে থাকত। অরবিন্দ এসে বেশী কথা বলত না, যা বলত তাও মৃদু স্বরে, যার প্রধান সুরটা হত আদরের। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে সে ম্লান ভাবে একটু হাসত। দেখে চারণীর মন যেত গলে। তার মনে হত মহাব্রতের মুখর প্রেমের চেয়ে অরবিন্দের নিঃশব্দ ভালবাসা ঢের বেশী কাব্যময়। মহাব্রতের উপস্থিতি অস্বাভাবিক, উন্মাদনাকর, অরবিন্দের কাছে বসে থাকার চেয়ে স্বাভাবিক কিছু নেই। চারণী টের পেত মহাব্রতকে সে ভয় করে। ভালবাসা দিয়ে যত নয় এই ভয় দিয়ে মহাব্রত তাকে বশ করেছে। মহাব্রতের প্রচণ্ড অস্থির জীবনী শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দেয়, তাই তার কাছে বসে থাকার সময় জগতে আর কোন মানুষ আছে বলে সে ভাবতে পারে না; আসলে অরবিন্দকেই সে ভালবাসে।

চারণীর এই দ্বিধা ও সন্দেহের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা এমনি জটিল যে বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনস্তত্ত্বের গবেষণার মত

শোনাবে। ঘটনাচক্রে প্রতিভা দুজনের একজন যদি কয়েকটা দিনের জন্য দূরে সরে যেত তাহলে সব গোলমালের অবসান হতে পারত, কিন্তু যেহেতু চারণীর কাছে একা থাকার সময় তাদের প্রত্যেকে টের পেত চারণী তাকেই ভালবাসে, কোন ঘটনাচক্রই তাদের একটি দিনের জন্য তফাতে নিয়ে যেতে পারত না, লুকোচুরি খেলার মত চারণীকে নিয়ে তারা জয়পরাজয়ের খেলা খেলত। সকালে চারণীকে জয় করে যেত মহাব্রত, বিকালে বিজয়ী হত অরবিন্দ। যেদিন চারণীর হৃদয়-দুয়ারে তাদের আবির্ভাব ঘটত একসঙ্গে সেদিন ঠিক কে যে জয়ী হল বুঝতে না পেরে দুজনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বাড়ী ফিরত, আর দুর্ব্বলচেতা চারণী দ্বিধাসন্দেহের পীড়নে ছটফট করে রাত কাটাত।

মোটা হতে আরম্ভ করে চারণী ভয় পেয়ে রোগা হবার জন্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেছিল, পেট ভরে খেত না, পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলত। ফলে, এই সময় মোটা হওয়া স্থগিত হলেও তার মনের মত তার শরীরটাও খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপরে তার অদ্ভুত সমস্যার অবিরাম পীড়ন সে সহ্য করতে পারলে না। তার অনিদ্রা অজীর্ণ ও অম্বলের ব্যারাম হল। তারপর হল নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন মহাব্রত ও অরবিন্দ দেখা করতে এলে দুজনকেই সে তাড়িয়ে দিলে এবং আশ্রয় নিলে শয্যার। তার অসুখের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে মহাব্রত ও অরবিন্দ বার বার তাকে দেখতে ছুটে গেল কিন্তু চারণী খবর পেয়ে চেঁচামেচি করে বাইরে থেকেই তাদের বিদেয় করে দিলে।

তারপর একদিন বাড়ীর সকলে সহরের অন্য প্রান্তে বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে গেছে, খালি বাড়ীতে চারণী অনেক রাত অবধি ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে একরাশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেললে। এক রাত্রির ঘুম অথবা চিরনিদ্রা কোন্‌টা তার কাম্য ছিল জানবার উপায় নেই, পরদিন

অনেক বেলায় তার ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল সে মরে গেছে। মরবার সময় বুকে বোধ হয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, জামা ছিঁড়ে আঁচড়ে আঁচড়ে নিজের বুক সে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছে।

খবর পেয়ে প্রতিভা দুজন দেখতে গেল।

চারণীর একটি বৌদি ছিল, অল্প বয়সে চারণীর অত্যন্ত বিদ্বান ও অত্যন্ত নীরস দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চোখের সামনে চারণীকে দুটি প্রতিভার পূজো পেতে দেখে তার বোধহয় খুব হিংসা হত। সেই দুজনকে চারণীর ক্ষত-বিক্ষত বুকটা দেখালে।

কেঁদে বললে, 'বুকে কত যাতনাই না জানি হয়েছিল।'

চারণীর মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর আগে একথা অনায়াসেই মনে করা চলত যে তার প্রেমিক প্রতিভা দুটির মধ্যে লড়াই বাধিয়ে সে কৌতুক উপভোগ করছে। সাধ করে যে মেয়ে নিজেকে প্রতিভাব উপযুক্ত কবে গড়ে তোলার পাগলামীকে প্রশ্রয় দিতে পারে সে এবকম কৌতুক উপভোগ করবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। চাবণীব মৃত্যুর পর এও খুব সহজে অনুমান করা গিয়েছিল যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিভা দুটি এবার তাদের মৃতা প্রিয়াকে অতি দ্রুত বিস্মৃত হবে। দুটি প্রেমিকের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে যে মেয়ে মজা দ্যাখে তাকে মনে রাখবে এমন প্রেমিক জগতে কে আছে? আসলে এ রকম মেয়ের প্রেমেই কেউ পড়ে না। জয় করার জেদটাকে মনে হয় প্রেম। মরে গেলে অথবা সরে গেলে এরকম মেয়েকে মনে রাখার বিশেষ কোন কারণ থাকে না। যে রাজ্য রসাতলে গেছে তার অধিকার নিয়ে মামলাবাজ দুটি রাজা হয়ত মারামারি করে মরে, হৃদয়-সংক্রান্ত জয়পরাজয়ের সমস্যা হৃদয়ের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, জেদ যায় জুড়িয়ে, মৃতার স্মৃতির প্রতি একটু দয়ার্দ্র কোমলতা ছাড়া প্রেমের চিহ্নটুকু থাকে

না। শুধু মহাব্রত ও অরবিন্দের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম টের পাওয়া গেল নিছক রেষারেষি তাদের প্রেমের ভিত্তি ছিল না, চারণী তাদের নিয়ে কৌতুক করে নি। প্রতিভা দুটির শোকের মাপকাটিতে আবার মাপজোক করে চারণীর হৃদয়ৈশ্বর্যের নূতন পরিমাণটা আবিষ্কার করে আমাদের অবাক হতে হল। ওরা দুজনে প্রমাণ করে দিল দু ফোঁটা চোখের জল নিয়ে মরবার মত সাধারণ মেয়ে সে ছিল না। হৃদয়-জয়ের বিপুল প্রতিভাই তার ছিল।

অরবিন্দ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে ষ্টুডিওতে আশ্রয় নিল, মহাব্রত চীনা আর ফিরিঙ্গি হোটেলে রকম রকম পানীয় চেখে বেড়াতে লাগল। একজন শুকিয়ে যেতে লাগল ঘরের কোণে নীরবে, আর একজন শুকিয়ে যেতে লাগল বাইরে হৈ চৈ করে। লড়াই যেন তাদের থামেনি। প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তারা যেন চারণীর জন্য পাল্লা দিয়ে শোক করতে লাগল। তাদের প্রতিভায় যারা সন্দেহ করত এবার তাদের সন্দেহ দূর হল। অল্পবিস্তর উন্মত্ততা প্রতিভার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তাদের এই অসামাজিক অস্বাভাবিক জীবনযাপনে আত্মীয়স্বজন ব্যথিত হল, প্রতিবাদ করল, বন্ধুবান্ধব হাসিগল্পের আড্ডায় টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের নির্লিপ্ত ভাব অব্যাহত রইল। হাসতে না জানলে এ জগতে বন্ধু টেঁকেনা, দুজনের মনোবিকার সহ্য করতে না পেরে বন্ধুরা তাদের রেহাই দিল। ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়ল আত্মীয়-স্বজন। সহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। কেবল একজন, পরের সুখদুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রবৃত্তি যার মজ্জাগত, সে-ই জোঁকের মত দুজনের পিছনে লেগে রইল। সে চারণীর ঈর্ষাতুরা বৌদি প্রিয়ম্বদা। কানাঘুষায় এদের ব্যাপার শুনে সে যেদিন জানতে পারল ভালবাসার চোটে তার ননদটিকে মেরে শোকের চোটে এবার এরা নিজেদের মারছে, সেইদিন

দরোয়ান পাঠিয়ে তুজনকে সে করল নেমন্তন্ন। কিন্তু এরা কেউ গেল না। তাতে অপমান বোধ করে প্রিয়ম্বদা দিন পনের আর উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু পরের সুখদুঃখের কারবার আয়ত্ত করার কৌতূহল প্রিয়ম্বদার বড় তীব্র। পনের দিন উঠতে বসতে যতবার তার মনে হল একটা লয়লা ও তুটি মজনুর আবির্ভাবের মত বিস্ময়কর ব্যাপার তার আশেপাশেই ঘটেছে, অথচ সময়মত ব্যাপারটা সে ভাল করে অধ্যয়ন করেনি ততবারই তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠতে লাগল। সে আবার দরোয়ান পাঠাল। এবার এরা তুজনেই নেমন্তন্ন গ্রহণ করল কিন্তু নেমন্তন্ন রাখতে ভুলে গেল। তৃতীয়বার প্রিয়ম্বদা দরোয়ানের হাতে তুজনকে কড়া মিঠে এমনি একটা অদ্ভুত চিঠি পাঠাল যে সেদিন বিকেল হবার আগেই তুজনে তাদের বাড়ী গেল।

চারণীর মৃত্যুর পর চারণীর বাড়ীরই বসবার ঘরে, যেখানে দেয়ালের গায়ে চারণীর ফটো ছিল আর চারণীর হাতে আঁকা ছবি ছিল আর অর্গানে চারণীর গান স্তব্ধ হয়ে ছিল আর আবহাওয়ায় চারণীর হাসির বেশ ছিল, সেইখানে প্রিয়ম্বদার মধ্যস্থতায় কবি ও ভাস্করের দেখা হল। পরস্পরকে দেখে প্রথমে তারা স্ত্রীলোকের মত হিংসা ও বিদ্বেষ অনুভব করল, তুজনেরই মনে হল গলা টিপে একটা মানুষকে হত্যা করতে পারলে তাদের সুখের সীমা থাকবে না। তারপর এই পাশবিক ইচ্ছার জন্য লজ্জায় তারা খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইল। তারও পরে তাদের তুজনের প্রত্যেকে স্থির করে নিল যে, না, বাস্তবজগতে তাদের শত্রুতা নেই; চারণীর দেহটা অদৃশ্য হয়েছে সত্য কিন্তু চারণীর প্রেম সে পেয়েছিল, সুতরাং আধ্যাত্মিক পরাজয়ের গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে যে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে তার সঙ্গে আর বিবাদ কিসের? প্রত্যেকে এই রকম ভেবে পরস্পরকে তারা ক্ষমা করল।

অরবিন্দ বলল, 'নতুন কবিতা কিছু লিখলেন? মরুনন্দিনীর কবিতাগুলি বড় ভাল লেগেছিল। মিছরির মত জমাট বাঁধা রস—তবে

ঝাঁঝটা একটু বেশী,—এ্যামোনিয়ার মত। বড় বেশী অভিভূত করে দেয়।'

মহাব্রত বললে, 'অল্প বয়সের লেখা। ঝাঁঝটাই তখন বেশী ছিল! নতুন কিছু লিখিনি। আপনি নতুন কিছুতে হাত দিয়েছেন? গতবার বোম্বের একজিবিসনে আপনার উর্বশী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

এই ভাসা ভাসা ভদ্রতার আলাপ গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যায় আলো জ্বালবার সময় এতদূর এগিয়ে গেল যে উপেক্ষিতা প্রিয়ম্বদা দেখে শুনে থ' বনে গেল। কেবল এদের দুজনকে নেমন্তন্ন করলে খারাপ দেখাবে বলে সে আরও দুচার জনকে বলেছিল, সকলের হাসিগল্প গানের মাঝখানে এই দুই মহাশত্রু যে পরস্পরের মধ্যে এমন করে ডুবে যাবে প্রিয়ম্বদার তা কল্পনাতেও আসে নি। ওবা কি পাগল? চেহারা অবশ্য দুজেনেরি অনেকটা পাগলের মত, তবু ঘরে যতগুলি লোক আছে তাদের সকলের চেয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ওরাই যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। খণ্ড খণ্ড ঝাপ্সা জগত নিয়ে যাদেব কারবার ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে সূর্য্যালোকের চেয়ে তীব্র আলোয ঝলসান সম্পূর্ণ-এক একটা জগত দেখে তাদের ভয়ই করে। তবু ওবাই এরকম খাপছাড়া কাণ্ডগুলি ঘটায় কেন? তাছাড়া, আলাপ করবে বলে সে ওদের নেমন্তন্ন করেছে। অথচ কথা কইলে জবাব পর্য্যন্ত দেয় না। খাওয়ার পর তার কাছে বিদায় না নিয়েই আলাপ করতে ওরা যখন চলে গেল প্রিয়ম্বদার মনে হল সকলের সামনেই সে কেঁদে ফেলবে।

তাদের ছাড়াছাড়ি হল পথে। দুজনের মনের পরিচয় পেয়ে দুজনের কাছেই তারা তখন অবাধ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা মিশতে পারে না; তাদের মনের গড়ন স্বতন্ত্র, তারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। আজ আলাপ আলোচনার উপযোগী একটি সঙ্গী লাভ ক'রে দুজনেই যেন তারা ধন্য হয়ে গেল। কথা রইল, পরদিন মহাব্রত অরবিন্দের

ষ্টুডিও দেখতে আসবে। সঙ্গে আনবে তার অপ্রকাশিত কবিতা। অরবিন্দ কবিতা শুনবে, মহাব্রত দেখবে মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

মহাব্রত সকালেই এল। কথা ছিল বিকালে আসবার। চাকর প্রথমে সোজা জবাব দিল যে দেখা হবে না। তারপর মহাব্রতের প্রচণ্ড এক ধমক খেয়ে সে অরবিন্দের বোন পদ্মাকে ডেকে আনল। পদ্মা বলল যে সকালে তার দাদা কাজে ব্যস্ত থাকে, কারো সঙ্গে দেখা করে না।

মহাব্রত রেগে আগুন হয়ে বললে, 'আমায় নিজে আসতে বলেছিল। দেখা করবে কি করবে না সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দয়া করে খবরটা দিন যে মহাব্রত এসেছে।'

পদ্মা বল্‌লে, 'আস্‌তে বলেছিল তো আসুন। খবর দেবার আমার সময় নেই।'

চাকরের সঙ্গে মহাব্রতকে সে চারতলায় অরবিন্দের ষ্টুডিওতে পাঠিয়ে দিল। ষ্টুডিওটা ধরলে বাড়ীটাকে চারতলা বলা চলে, আসলে তিনতলা বাড়ীর ছাদে অরবিন্দ ষ্টুডিও বানিয়েছে। দেওয়াল ইটবালিব চেয়ে কাঁচেরই বেশীর ভাগ, মাথার উপরে স্কাই লাইটও আছে। আলোয় ষ্টুডিওর ভেতরটা ঝলমল করছিল। ভেতরে ঢুকে হঠাৎ যেন আহত হয়ে মহাব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। অরবিন্দ নিবিষ্টচিত্তে চারণীকে রূপ দিচ্ছে, পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি চারণী। সমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ কয়েকটি মাটি ও পাথরের দর্শক ষ্টুডিওর এক কোণে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে।

অরবিন্দ তার দিকে পিছন ফিরেছিল, তার আবির্ভাব সে টের পেল না। মহাব্রত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্যমুখী মর্ম্মরশুভ্রা চারণীকে দেখল। মহাব্রতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ক'দিনের মধ্যেই চারণীর জীবন সমস্যার ভারে পীড়িত হয়ে উঠেছিল, চারণীর অবাধ নির্ম্মল হাসি ও চোখের

সকৌতুক চাহনি দেখবার সুযোগ তার কখনো হয় নি। এই চারণীকে তার অচেনা মনে হল। তার অগোচরে চারণীর এই অভিব্যঞ্জনা ও ভঙ্গিমার সঙ্গে অরবিন্দের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে পাথরে সে তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, এ কথা মনে করে মহাব্রতের হৃদয় ঈর্ষায় উদ্বেল হযে উঠল। চারণীর এই প্রতিমূর্ত্তিতে অনেক খুঁত ছিল। সে খুঁতগুলিকে পর্য্যন্ত মহাব্রত চারণীর অদেখা রূপের বৈশিষ্ট্য বলে ভেবে নিল। তার কষ্টের সীমা রইল না।

অরবিন্দ যখন তাকে দেখতে পেল সে হাঁ করে চারণীর দিকে তাকিয়ে আছে, গত রাত্রির নিবিড় অন্তরঙ্গতা ভুলে গিয়ে অরবিন্দ প্রথমে খুব বিরক্ত হল। এমন কি খবর না দিযে একেবারে ষ্টুডিওতে উঠে আসাব জন্য কযেকটা রূঢ় কথা তার ঠোঁটের কাছে এগিযেও এল। কথাগুলি চেপে নিযে সে বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন ?'

মহাব্রত বললে 'এই খানিকক্ষণ। দুটো মূর্ত্তি করেছেন কেন ?'

এ প্রশ্নের জন্য একটু ভণিতাব প্রযোজন ছিল। অন্ততঃ কিছুক্ষণ অন্য কথা বলে প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেও আকস্মিকতা একটু কমত। কাল তারা ইঙ্গিতেও চারণীর সম্বন্ধে কোন কথা বলে নি।

অরবিন্দ বলল, 'এ মূর্ত্তিটা ভাল হয নি। মন শান্ত হবার আগেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম, অনেক খুঁত থেকে গেছে। হাসিটা বড় স্পষ্ট আর—'

মহাব্রত ছেলেমানুষের মত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'আপনার মন শান্ত হয়েছে ?'

অরবিন্দ বলল, 'হ্যাঁ।'

সেইদিন থেকে মহাব্রত প্রতি সন্ধ্যায় হোটেলে হোটেলে মদ চেখে বেড়ান বন্ধ করলে। দিবারাত্রি একটা অস্থির আবেগে সে চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত

হয়ে রইল। কাব্যের যে প্রেরণা তার মদের নেশার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল আবার তাকে পৃথক করে আয়ত্ত করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠল। জগতের সমস্ত কবির দুয়ারে সে স্মরণ নিল, কবিতার পর কবিতা পাঠ করল। নিজের পূর্ব্বকৃত রচনা পড়ে পড়ে সে নিজেকে খুঁজল। বড় কষ্টে মহাব্রতের দিন ও রাত্রি কাটতে লাগল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে সে শিথিল হতে দিলে না। পাথরে চারণীকে অমর করার তপস্যায় অরবিন্দ অনেকদূর এগিযে গেছে। কবিতায় চারণীকে অমর করতে হলে তার তপস্যা আরও উগ্র হওয়া চাই।

মহাব্রতের শরীর অল্পে অল্পে ভাল হল। মনে ধীরে ধীরে ভাব ও আবেগের আবির্ভাব হতে লাগল। ফাল্গুনের গোড়ায় অনেক রাত্রে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সাগর-ভেজা বাতাসেব আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করতে করতে মাঝে মাঝে সে যেন সুর ছন্দ ধ্বনি ভাব গন্ধ বেদনা প্রভৃতির সমন্বয় করা তার হারানো কাব্যজগতের সন্ধান পেতে লাগল। সব অস্পষ্ট, ঝাপ্সা। তবু আশা জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। লেখার তাগিদও যেন সে অনুভব করল। ক্ষীণ, ভীরু সে তাগিদ। মহাব্রত তাতেই খুশী হল। তারপর চৈত্রমাসে একদিন রাতে সে চারণীকে স্মরণ করে লিখতে বসল স্মৃতি-কাব্য, ইন-মেমোরিয়মের মত যার অমরতা চারণীকে অমর করবে। তাকেও করবে অবশ্য কিন্তু সেটা বাহুল্য, তার কোন প্রতিকার নেই। পুরানো দিনের মত কাগজপত্র ছড়িয়ে, বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে রূপার দীপাধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে সে লিখতে বসল। পাশের ফুলদানি থেকে সোনা রং-এর চাঁপা আর সবুজ রঙের কাঁঠালি চাঁপা ফুল পুরোনো দিনের মত তাকে তীব্র মিশ্রিত গন্ধ সরবরাহ করতে লাগল। গভীর রাত্রির নিজস্ব ছাড়া ছাড়া শব্দ দিয়ে ভাগ করা যে স্তব্ধতায় আগে সে কবিতা লিখত আজও সে স্তব্ধতাই তাকে ঘিরে রইল। কিন্তু একলাইন কবিতা সে

লিখতে পারল না, কলম হাতে করে যতক্ষণ সে ঈষৎ নীলাভ কাগজের দিকে চেয়ে রইল তার সময় ব্যেপে তার মনে জেগে রইল এই কথাটা যে, চারণীকে অমরতা দেবার জন্য সে কবিতা লিখতে বসেছে। এই জ্ঞানকে মগ্নচেতনায় তলিয়ে দিয়ে আসল কবিতাকে সে মনে আনতে পারল না। মহাব্রতর ভয় হল। পরদিন সে আবার লিখবার চেষ্টা করল। যে অবস্থায় সে তার শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছে তেমনি অনুকূল অবস্থাতেও আজ এক লাইন কবিতা তার মনে এল না। কতকগুলি জোড় বিজোড় শব্দ শুধু তার মনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

মহাব্রতর শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ভয়ে সে যেন মরার মত হয়ে গেল। এ কোন অদৃশ্য দুর্বোধ্য শক্তি তার প্রকাশের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার কাব্যের উৎসমুখে শিলার মত চেপে বসেছে? আর আত্মাকে অবরোধ করেছে কিসে? মহাব্রতর ঘুম এল না বলে তার মদ খাবার ইচ্ছা হল। বাড়ী থেকে মদের গন্ধটুকুও বিতাড়িত করে দিয়েছিল বলে হঠাৎ সবদিক দিয়ে নিজেকে ব্যর্থ ও অসহায় মনে করে সে কাঁদল। সেদিন সকালে অরবিন্দের ষ্টুডিওতে চারণীকে দেখে সে টের পেয়েছিল চারণী অরবিন্দকে ভালবাসত। তা না হলে অরবিন্দের জন্য সে অমন করে হাসবে কেন, অমন করে চাইবে কেন? সে দিন থেকে মহাব্রতের একটা স্বর্গ ভেঙে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। চারণীর অমর স্মৃতি-কাব্যটিও যদি সে লিখতে না পারে, সেই পরাজয় সে সহ্য করবে কি করে? বেঁচে থাকবে সে কিসের জন্য?

বেঁচে থাকাব উদ্দেশ্য অবশ্য জগতে সংখ্যাতীত, খুঁজলেও মেলে, না খুঁজলেও মেলে, কিন্তু মহাব্রত প্রতিভাবান কবি বলে চারণীর স্মৃতিকে অবলম্বন করে এক অমর ব্যথাকাব্য রচনা করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই দেখতে পেল না। এও সে ভুলে গেল যে উত্তেজিত

অশান্ত মন নিয়ে অমর কাব্য রচনা করা যায় না। হ্যালামের মৃত্যুর সতর বছর পরে টেনিসনের ইন-মেমোরিয়ম প্রকাশিত হয়, বন্ধুকে যখন কবি ভুলে গেছে, সুদূর অতীতে নিয়তির রূঢ় আঘাতে প্রাপ্ত ভার-তরঙ্গের স্মৃতিটুকু মাত্র যখন কবির অবলম্বন, বন্ধুবিয়োগ-বেদনা নয়। আর সে তো শুধু বন্ধু। নিজের মরণ ঘনিয়ে না এলে সুদূর অতীতে হৃদয়ে বিপর্য্যয় আনা স্মৃতিটুকু মাত্র মনে রেখে মৃতা প্রিয়াকে কে ভুলতে পারে যে অমর স্মৃতিকাব্য লিখতে পারবে? করুণ রসে টইটুম্বুর কবিতা লেখা যায়, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের সেই আবেগ উগ্র কাব্য নিয়ে মানুষ হৈ চৈও করে, কিন্তু লোনা রাসায়নিক চোখের জলের মত সে বাঁচবে কেন, সে উপে যায়,—সে তো মড়াকান্না। প্রতিভাবান কবি হয়েও মহাব্রত এ সব কথা যেন ভুলে গেল। জবরদস্তি করে পর পর কয়েক রাত্রি সে কাব্য লিখল আর সকালে উঠে না পড়েই ছিঁড়ে ফেললে।

তারপর সে সহর ছেড়ে গেল পালিয়ে

নানা দেশ ঘুরে মন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে হঠাৎ এক দিন তার মনে হল চারণীকে নিয়ে যে কারণে সে কবিতা লিখতে পাবে নি তা হয় ত এই যে, তার কবি-মন কাব্য রচনার অনুপযোগী স্মৃতিকেই শুধু গ্রহণ করেছে। চারণীর জীবনে যে আবহাওয়া ছিল, যেটুকু বাস্তবতা সমস্ত কবিকল্পনাব ভিত্তি, হয়ত সে তা হারিয়ে ফেলেছে। যে সব বস্তু ও বাস্তবতা চারণীকে ঘিরে ছিল তাদের মাঝখানে বসে লিখলে সে লিখতে পারবে। চারণীর অনুশীলন কক্ষটির কথা মহাব্রতর মনে এল। সে-ঘরে দীর্ঘ কাল ধরে সে নিজেকে প্রতিভার উপযোগী করে গড়ে তুলেছিল। সেই ঘরে বসে সে ছবি আঁকত, কবিতা পড়ত, ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করত, সাহিত্যের পরিচয় নিত। চারণীর আঁকা ছবি ও খোদাই করা মূর্ত্তি, তার পড়া অসংখ্য বই, তার ব্যবহার করা অসংখ্য বস্তু সে ঘরে চারণীর স্বকীয়তাকে আজও ধরে

রেখেছে। ওই ঘরে দুদণ্ড বসলে স্মৃতি-কাব্যের আরম্ভটা হয় ত সে আয়ত্ত করতে পারবে।

আশান্বিত হৃদয়ে মহাব্রত কলকাতায় ফিরল। কোন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করতে আজকাল তার ভয় করে। প্রথমে দুদিন বিশ্রাম করে নিল। পরের দিন সকালে সে গেল চারণীদের বাড়ী। শুনল চারণীর সেই ঘরখানা সাফ করে তিন দিন আগে প্রিয়ম্বদা একটি মেয়ে প্রসব করেছে। চারণীর ছবি বই প্রভৃতি জিনিসপত্র খানিক এ-ঘরে ও খানিক সে-ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

চারণীর শোবার ঘর ?

সে ঘরে চারণীর পিসীমা শোন।

তারপর মহাব্রত অনেক ভেবে একদিন অরবিন্দের ষ্টুডিওতে গেল। সেখানে চারণীকে একবার অনেকক্ষণ ধরে দেখে এসে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এতে তাব লজ্জা, চারণীকে অমর করার গৌরব এতে তার ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু উপায় কি ? যেখান থেকে হোক স্মৃতি-কাব্য আরম্ভ করার প্রেরণাটুকু সংগ্রহ করতে না পাবলে তার যে একেবারেই পরাজয়।

অরবিন্দ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বলল, 'আসুন।'

মহাব্রত চেয়ে দেখল, চারণীব দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি সমাপ্ত হয়েছে। আগেকার হাস্যমুখী মূর্ত্তির চেয়ে এ মূর্ত্তি বহুদিক দিয়ে ভিন্ন—সব দিক দিয়ে। সে মূর্ত্তির খুঁত ও অসম্পূর্ণতা আজ এ মূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করে সে ধরতে পারল। চোখের পলকে এও সে বুঝতে পারল এবারও অরবিন্দের কাছে তার হার হয়েছে। অরবিন্দ সৃষ্টি করেছে চারণীকে, ঈষৎ স্থূলকায়া, ভীরু চোখ, শ্রান্ত বিপন্ন হাসি, দ্বিধা সন্দেহ ভয়ে লেপা মুখ, নিখুঁত ও আসল চারণী। অববিন্দ তাকে অমরতা দেয়নি, পরের কাছে এ মূর্ত্তি হয়ত প্রশংসার বেশী কিছু পাবে না কিন্তু কি দাম অমরতার ? অরবিন্দ

যতকাল বাঁচবে চারণী তার সঙ্গে থাকবে। মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনে চারণীকে সে জীবন-সঙ্গিনী করেছে। এরপর তাকে স্মৃতিকাব্যের অমরতা দিতে চাওয়া হাস্যকর।

মহাব্রতর মাথার ভেতরে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অরবিন্দের হাতুড়ি আর বাটালিটা তুলে নিয়ে চারণীর মুখখানা সে ক্ষত বিক্ষত করে দিল। সে যেন অসতী স্ত্রীকে সাজা দিচ্ছে। অরবিন্দ সবটুকু জীবনীশক্তি ব্যয় করে এই মূর্ত্তি গড়েছিল। চামড়া দিয়ে হাড়ঢাকা শরীরে তার একটুও শক্তি ছিল না। এবারও সে তার চারণীকে বাঁচাতে পারলে না।

আশ্রয়

শচীন দত্তের বাড়ীতে চাকর টেঁকে না। মাইনে কম, খাওয়ার কষ্ট, পান থেকে চুণ খসলে গালাগালি, সুতরাং চাকর টিঁকবে কেন! কেরাণীর মত ওদের চাকরী তো দুর্লভ নয়, লোকে ডেকে নিয়ে কাজ দেয়।

একমাস কাজ করে দীনবন্ধুও পালাবার উপায় দেখল। নতুন মাসের দুই তারিখে সে একপয়সা দিয়ে চারখানা চিঠির কাগজ কিনে ফেলল। আড্ডায় বসে আদালতের পিয়নকে দিয়ে এই মর্ম্মে পত্র লেখাল যে, দেশে তার বৌ মরমর, স্বামীকে যেতে লিখছে সকাতরে।

চিঠি পড়ে শচীন দত্তের স্ত্রী বিমলা নাক সিঁটকে বললেন, 'মরমর তো চিঠি লিখলে কি করে শুনি?' সেজমেয়ে নন্দরাণী হেসে বলল, 'বজ্জাতি, নারে? তোর বৌ তোকে খামে চিঠি লেখে, ইস! কই দেখি বার কর্‌ত খামটা?'

দীনবন্ধু বলল, 'খামটা ফেলে দিয়েছি আজ্ঞে। আর তেনা চিঠি লিখবে কেন, চিঠি লিখেছে আমার ভাই জগবন্ধু।'

দীনবন্ধুর পেটে অনেক বুদ্ধি।

বিমলা অনেকক্ষণ তানানানা ভাঁজলেন, শেষে বললেন, 'আচ্ছা যাস বাড়ী, কিন্তু লোক দিয়ে যেতে হবে বাছা। নইলে মাইনে পাবিনে।

নন্দরাণী বলল, 'এই শীতে আমাকে দিয়ে বাসন মাজালে তোর কি হবে জানিস? গাড়ীতে কলিসন হয়ে বাড়ীর বদলে একেবারে স্বর্গে চলে যাবি।'

দীনবন্ধু আড্ডায় ফিরে বঙ্কু বঙ্কুকে ধরল তাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। বিশেষ কিছুনা, সে শুধু একবেলা শচীন দত্তের বাড়ী কাজ করে আসবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দীনবন্ধু বলবে, এই লোক দিলাম, দাও মাইনে। মাইনে নিয়ে সে সটকাবে, বঙ্কুও সে-বেলাটা খেটে পরদিন আর ওমুখো হবে না।

বঙ্কু ত্রিশ বছরের জোয়ান, কিন্তু তার মুখে একটা অসুস্থ বিমর্ষতার ছাপ। মাঝে মাঝে তার মাথার কল একেবারে বিগড়ে যায়। তখন সামান্য একটা কথা বুঝতে তার এত দেরী হয়, এমন ভাবে সে হাবার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যে দেখলে মমতা হয়। মাথা যখন অনেকটা পরিষ্কার থাকে তখনও সে মুখ ভার করে একপাশে চুপচাপ বসে থাকে, সহজে কথা বলতে চায়না, তাস খেলায় যোগ দিতে আহ্বান করলে শুধু মাথা নাড়ে। দুপুর বেলা তেরো টাকার হারমোনিয়মের বেখাপ্পা আওয়াজের সঙ্গে দেড় টাকার তবলা পিটে আড্ডায় যখন বিষম সঙ্গীত চর্চ্চা হয়, বঙ্কু নির্লিপ্তের মত একধারে পড়ে থাকে। সকলে বেশী রকম হৈ চৈ আরম্ভ করলে সে আড্ডা ছেড়ে চলে যায় এবং অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে আসে। বঙ্কুর জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, জীবনের কলরবের প্রতি ওর তাই বিরক্তি।

দীনবন্ধুর প্রস্তাবে অনেক কৌতুক ছিল, যারা শুনল সকলে হাসল—বিশেষ করে বিপিন দাস। বঙ্কু কোন দিন হাসে না, সে শুধু স্বীকার করে বলল, 'আচ্ছা।'

বিমলা বললেন, 'এই নাকি তোর নতুন লোক? যে ফর্সা জামা-কাপড়, থাকলে হয় টিকে!'

দীনবন্ধু বলল, 'বাপরে, আমি দিয়ে যাচ্ছি, টিঁকবে না?'

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

বঙ্কু বলল, 'বঙ্কু।'

'ব্রঙ্কো? কি কালার? ব্রাউন না ব্ল্যাক্?' বলে নন্দরাণী হাসল।

বঙ্কু বলল, 'ব্ল্যাক। ব্ল্যাক মানে কালো।'

নন্দরাণী অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তুমি ইংরাজী জানো?'

বঙ্কু বলল, 'বুক ফার্সট্—হর্স মানে ঘোড়া, সোয়ান মানে হাঁস।'

শুনে নন্দরাণী রাগ করে সেখান থেকে চলে গেল। বঙ্কু এদিক ওদিক চেয়ে কলতলায় গিয়ে অঞ্জলি পেতে জল খেতে আরম্ভ করল। বিমলা মুখভার করে বললেন, 'ইঞ্জিরী জানা চাকর আমাদের দরকার নেই দীনু। তুই অন্য লোক দেখে দে। ব্যাটা মেয়ের মুখের ওপোর ইঞ্জিরি ঝেড়ে দিল!'

দীনবন্ধু বিপদগ্রস্ত হয়ে বলল, 'একটু পাগলাটে মা কিন্তু কাজ দেখ্‌লে অবাক হয়ে যাবেন। কিছু খেতে চায় না, দুমাস খেটে একমাসের মাইনে নেয়। মাসকাবারে মাইনে দিতে গেলে বলে আজ তো মাসের অর্দ্ধেক এখন মাইনে নেব কেন?—মাথাটা একটু খারাপ। দু'টাকা কম দিলেও খুসী হয়ে কাজ করবে।'

বিমলা নরম হয়ে বললেন, 'কিন্তু পাগল-ছাগল লোক—'

দীনবন্ধু জিভ কাটল, 'পাগল কেন হবে মা, পাগল নয়। ছেলে বৌ মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন একটু হাবা মত হয়ে গেছে, এই মাত্তর। অপঘাতে মরল কিনা ছেলে আর বৌটা, তাই—'

নন্দরাণী ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের অপঘাতরে?'

দীনবন্ধু বলল, 'অপঘাত বৈকি আজ্ঞে। নদীর ধারে গ্রাম, বৌটাকে কুমীরে নিলে, ছেলেটা ঘোলো জলে ডুবে। সে কি ছেলে দিদিমণি, যেন

রাজপুত্তুর! সেদিন সন্ধ্যে লেগেছে কি লাগেনি, মহাকাল ডাকলে, আয় বন্ধুর বৌ, আয় বন্ধুর ছেলে। মহাকালের ডাক, সাড়া না দিয়ে তো উপায় নেই, ছেলের হাত ধরে বৌটা জল আনতে গেল নদীতে। সেই যে গ্যালো দিদিমণি, আর ফিরে এল না। দেহ আমরাই খুঁজে পেলাম চরের মধ্যে এক গর্তে।'

নন্দরাণী বলল, 'সেই থেকে বন্ধুর মাথা খারাপ হ'যে গেছে বুঝি?'

'আজ্ঞে। কিন্তু কোন জুলুম নেই দিদিমণি, খুব ঠাণ্ডা। গাল দিলেও ফিরে কথাটি কয় না।'

'তবে মার খুব সুবিধে হবে' বলে নন্দরাণী হাসল।

মাইনে হস্তগত করে প্রস্থানের আগে দীনবন্ধু হেঁকে বলে গেল, 'ভাল করে কাজ করিস বন্ধু, এমন মুনিব আর পাবি নে। দুবেলা গিন্নিমার পায়ের ধুলো নিস।'

কলতলায় বাসন ছড়ানো ছিল, আদেশের অপেক্ষা না রেখেই বন্ধু সেগুলি মাজতে আরম্ভ করেছিল, ফিরেও তাকাল না। উঠানে লিচু গাছের ব্যাপক ছায়া। একপাশে চৌবাচ্চা ও কল, সেখানে পাতার ফাঁকের চিকরি-কাটা আলোছায়ার আল্পনা। নন্দরাণীর মনে হল নতুন চাকরটা যেন রোদ আর ছায়া দিয়ে বোনা চেক্ আলোয়ান গাযে জড়িয়ে বাসন মাজতে বসেছে, যার বৌকে খেয়েছে নদীর কুমীর, ছেলেকে খেযেছে নদী নিজে।

'—ওকে বেশী বকাবকি কোরোনা মা। দুঃখী লোক।'

বিমলা চটলেন, 'আমি বুঝি খালি বকাবকি করি?'

'করনা? দীনবন্ধু পায়ের ধুলোর ঠাট্টা করে গেল কেন, ধরতে পারনি? একটা পাগলাকে দিযে ও মিছামিছি পালিযেই বা গেল কেন তবে? মিছামিছি নয়? খামের চিঠি মা, খামের চিঠি! দীনবন্ধুর বৌ খামে চিঠি লেখে!'

রান্নাঘর থেকে একটা এঁটো গ্লাস নিয়ে নন্দরাণী কলতলায় গেল।

'এটা আগে মেজে দাওত বঙ্কু।'

বঙ্কু থালা মাজা বন্ধ করল। আঙ্গুল দিয়ে বাসনগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের আগে? ওগুলি মাজার আগে না সকলের আগে?'

হাসির কথা, নন্দরাণী কিন্তু হাসল না। বলল, 'সকলের আগে। জল খাব কিনা, তাই।'

বঙ্কু একটু ভেবে বলল, 'এক মিনিট লাগবে।'

'লাগুক, তুমি মেজে দাও।'

বঙ্কু গ্লাসটা' মাজল, গ্লাসের সঙ্গে হাতও ধুয়ে কল থেকে জল ভরে নন্দরাণীকে দিল। কি জানি কি ভেবে গম্ভীরমুখে বলল, 'নদীর জল খুব মিষ্টি, কলের জলে স্বাদ নেই। দেশে আমরা নদীর জল খাই।'

নন্দরাণীর মনে হল সত্যই জলে স্বাদ নেই। তার আরও মনে হল, বঙ্কুর দেশের নদীর নাম যদি গঙ্গা হয়! তবে তো বঙ্কু তাকে হাতে করে যে জল দিল তার মধ্যে বঙ্কুর বৌয়ের সূক্ষ্মতম এক কণা রক্ত আর বঙ্কুর ছেলের তিল পরিমাণ প্রাণ মিশে ছিল! বঙ্কু তাকে কি খাওয়াল? কি গিলে ফেলল সে? জলটা অমন বিস্বাদ লাগল কেন?

বঙ্কুর শোকার্ত্ত উপস্থিতিটা স্নায়ুতে ঘা মারছিল, নন্দরাণীর মনে হল সত্যই কিরকম একটা বিশ্রী বোটকা স্বাদ আটকে রয়েছে জিভে।

'তোমার দেশ কোথায় বঙ্কু? গঙ্গার ধারে?'

বঙ্কু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি করে জানলেন?'

আর কি করে জানলেন! নন্দরাণীর সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল, সে সেইখানে বসে পেটের সব উগ্‌রে ফেলে দিতে আরম্ভ করল। শুধু জল নয়, অবেলায় খাওয়া ডাল ভাত

তরকারী। তার যতই মনে হতে লাগল সেগুলি কুমীরের ভুক্তাবশিষ্ট বঙ্কুর বৌয়ের পচা মাংস, ততই বমির ধমক বেড়ে গিয়ে নন্দরাণীর দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হল।

বঙ্কু হতভম্ব। জ্বর হয়ে তার বৌ একদিন এমনিভাবে বমি করেছিল। কিন্তু এতো তার বৌ নয়, এ তেমনিভাবে বমি করে কেন?

বিমলা ছুটে এলেন, বড় ছেলে সরোজ ছুটে এল, ছেলে মেয়ে যে যেখানে ছিল মুহূর্ত্তে কলতলায় হাজির হযে গেল। সুস্থ হয়ে কলসীর জলে মুখ ধুযে নন্দরাণী ঘরে গিয়ে শুযে পড়ল। খানিকক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ এক সময় বালিশে মুখ গুঁজে সে বেজায় হাসতে আরম্ভ করে দিল। বিমলার কাছে খবব গেল নন্দরাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদছে!

বিমলা এলেন,—'ও রাণী কাঁদিস কেন?'

নন্দরাণী হাসিমুখ বার করে বলল, 'কাঁদছি কই, হাসছি। ভূতে পেয়েছে ভাবছ? হিষ্টিরিয়া হয়েছে? তা নয় মা। আমার নার্ভগুলি গোল্লায গেছে—এক শিশি নার্ভটনিক কিনে দিও আমায়। নদীতে স্রোত থাকে সে কথাটা কি একবারও মনে হল ছাই। মিথ্যে বমি করে মরলাম। বঙ্কুর ছেলে বৌ এ্যাদ্দিনে সমুদ্রে পৌছে গেছে, কি বল মা? ··কে রে?'

বঙ্কু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, একগাল হেসে বলল, 'আমার বৌ বমি করে কাঁদত। একদিন'—নন্দরাণী ধমক দিয়ে বলল, 'যা চলে এখান থেকে, পাজী!

বঙ্কু ধীরে ধীরে সরে গেল।

রাত্রি এগারটায় বঙ্কু আড্ডায় ফিরল। তিন জোড়া তৈলকৃষ্ণ তাসে বিন্তি কাবার হচ্ছে। বিপিন বাজারের দিকে গিয়েছিল, সে পুঁটির সম্বন্ধে

গোপনীয় সংবাদ দিচ্ছে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন চাকরি করলি বঙ্কু ?'

বঙ্কু বলল, 'বেশ।'

দীনবন্ধু বলল, 'কাল যাস আমার সঙ্গে, বোস-বাবুদের বাড়ী চাকরী করিয়ে দেব।'

বঙ্কু বলল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু খুব ভোরে উঠে বঙ্কু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে দীনবন্ধু অবাক হয়ে গেল।

'কোথায় চলেছিস রে ?'

'কাজে যাচ্ছি। দিদিমণি খুব সকালে যেতে বলে দিয়েছে।'

'ওখানে তুই কাজ করবি নাকি ?'

'করব', বলে বঙ্কু চলে গেল।

দীনবন্ধু সকলকে বলল, 'একদম ক্ষেপে গেছে। ব্যাগার খাটতে চলল ভূতের বাড়ী।'

বঙ্কুর কাজ বেশ, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা কইলেই মুস্কিল বেধে যায়। নিজে নিজে পনের মিনিটের মধ্যে সব মসলা বেটে ফেলে, কিন্তু হলুদটা আগে বেটে দিতে বললেই তার সব গোল পাকিয়ে যায়। প্রত্যেকটি হলুদ পাঁচ মিনিট ধরে কচলে কচলে ধোয়, বাটতে আরম্ভ করে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি সব ভাবতে থাকে, শেষে নন্দরাণীকে বলে, 'আমার বৌ খুব তাড়াতাড়ি হলুদ বাটতে পারত। আমার অনেকক্ষণ লাগে। বৌ কি করে হলুদ বাটত ভাবছি। এমনি করে নোড়া ধরত ?'

দুমাসে এক মাসের মাইনে নেয়, তাও কম, বিমলা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে চলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব কোথায় যাবে। তিনি বলেন, 'আ-মরণ! যেমন করে রোজ বাটিস তেমনি করে বাটু না ? রাণীর

মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস যে হাঁ করে? ও জানে নাকি তোর বৌ কেমন করে নোড়া ধরত?'

নন্দরাণী মাকে সরিয়ে দেয়, বলে, 'তুমি যাও মা এখান থেকে। তুমি মুখ ছোটালে এমন ভড়কে যাবে যে সারাদিনেও হলুদ বেটে উঠতে পারবে না।'

বঙ্কুকে বলে, 'আমি দেখিয়ে দেব বঙ্কু?'

কথাটা বুঝতে বঙ্কুর সময় লাগে। বুঝে বলে, 'দেখি হাত?'

নন্দরাণী হাত দেখায়। বঙ্কু মাথা নেড়ে বলে, 'নরম হাত, ব্যাথা হবে। আমার বৌএর হাত খুব শক্ত ছিল। একদিন এমন চড় মেরেছিল—কাকে?'

বঙ্কু অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, 'পাঁচুকে। পাঁচু ঘুরে পড়ে গিয়েছিল চড় খেয়ে। তারপর মা ব্যাটায় কি কান্না!'

নন্দরাণী বলে, 'চড় মেরে পাঁচুর মা কেঁদেছিল কেন?'

অনেক ভেবেও বঙ্কু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, করুণ চোখে নন্দরাণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, নন্দরাণীর মনে হয় তার মনের ভেতরটা যেন ভিজে সেঁতসেঁতে হয়ে আছে—কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। এতবড় জোয়ান লোকটা নিজের মনের কুযাশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু মসলা চাই, নইলে রান্না বন্ধ, নন্দরাণী বলে, 'তোমার দেরী হবে, আমায় দাও।

এ যেন অন্যায় শাসন, এমনি মুখ করে বঙ্কু জোরে জোরে মসলা বাটতে আরম্ভ করে। নন্দরাণীর মনে হয় শিলটাই বুঝি সে ভেঙে ফেলবে।

চাকরকে ধমকানো এবাড়ীর ছেলে বুড়োর ধাতস্থ, দিনকয়েক সংযত হয়ে চললেও ক্রমেই সকলে নিজের নিজের মেজাজ প্রকাশ করতে আরম্ভ

করল। অন্য সকলের চেয়ে বিমলাই বেশী, কারণ তিনি বাড়ীর গিন্নি বলে সর্ব্বদা চাকরের সঙ্গে তাকেই কারবার করতে হয় এবং তাতে মেজাজ প্রকাশের সুযোগ অহরহ উপস্থিত থাকে। নন্দরাণী বঙ্কুকে ধম্‌কায় না তা নয়, কিন্তু অন্য কাউকে সে বেশী ধমকাতে দেয় না। বঙ্কু যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার খুসী হলে সে বকবে, মারবে, কিন্তু অন্যে তা পারবে না, নন্দরাণীব মনোভাব কতকটা এই রকম। অন্য সকলে বঙ্কুর প্রতি ক্রুদ্ধ হযে উঠলে নন্দরাণী রাগ করে কড়া কথা শুনিযে তাদের থামিযে দেয়, মাকে অনেক কবে বুঝিযে বলে, 'একরকম মাগনার চাকর, ওকে কেন বক' বলত? চলে গেলে ভাল হবে বুঝি?' বিমলা চুপ করে থাকেন, কিন্তু রাগ হলে ফেব বকেন। কিন্তু তার বকুনি গালাগালির রূপ নিতে পারে না, সুরুতেই নন্দবাণী থামিযে দেয।

একদিন খাওয়া নিযে গণ্ডগোল বাধল। অল্প দুটি ভাত আর একটু ডাল ছাড়া বঙ্কুর জন্য সেদিন কিছুই ছিল না।

অন্য দিন নীরবে খেযে যায়, আজ বঙ্কু বলল, 'তরকারী কই?'

বিমলা বলিল, 'তবকাবী নেই, ওই দিযে খা।'

বঙ্কু বলল, 'তবে আমায় দুধ দাও। নইলে খাব না।'

'তোকে উনুনের ছাই দেব। না খাস ত উঠে যা।'

কিন্তু বঙ্কু উঠেও গেল না, ভাতও খেল না, খালি মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'দুধ দাও। আরে, দাওনা দুধ! কি দিয়ে ভাত খাব? দুধ দাও।'

তার মাথা নাড়ার রকম দেখে শঙ্কিত হযে বিমলা ডাকলেন, 'ও রাণী, ত্থাখসে বঙ্কু কেমন করছে।' নন্দরাণী এল।

'কিরে বজ্জাত? বদ্‌মাসি হচ্ছে? খা বলছি!'

'একটু দুধ দেবে না? এক কড়াই দুধ কে খাবে?'—বঙ্কুর স্বরটা অত্যন্ত করুণ।

নন্দরাণী বলল, 'তোকে কচু দেব। নবাবপুত্তুর কিনা, দুধ খেতে দেবে ওকে! ডাল দিয়ে খা।'

বঙ্কু নীরবে খেতে আরম্ভ করল। নন্দরাণী সগর্ব্বে মার দিকে চেয়ে ঘরে চলে গেল। অর্থাৎ একটু ডাল তো আছে, আমি ইচ্ছে করলে ওকে শুধু ভাত খাওয়াতে পারি!

বঙ্কু যে তার মুখের কথায় বাঁচে মরে এর আনন্দে নন্দরাণী দিশেহারা।

বঙ্কুকে শাসন করে নন্দরাণী আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখল, বঙ্কু দরজার বাইরে চুপ করে বসে আছে।

সদয় হয়ে বল্ল, 'কিরে বঙ্কু!'

বঙ্কু বলল, 'আমার পেট ভরে নি।'

'আমি তার কি করব? আড্ডায় গিয়ে খেয়ে আয়গে যা। আমাকে জল দিয়ে যাস্ একগ্লাস!'

জল দিতে ঘরে ঢুকে বঙ্কু আর বাইরে যেতে চায় না! নন্দরাণী বলল, 'যাবি না আড্ডায়?'

বঙ্কু মাথা নাড়ল। নন্দরাণী বলল, 'তবে আমার একটু পা টেপ।'

বিমলা দেখে রাগ করে বললেন, 'ওকে দিয়ে পা টেপাচ্ছিস্ যে? ওই জোয়ান মদ্দ—ধিঙ্গি মেয়ের যদি একটু বুদ্ধি সুদ্ধি থাকে।'

নন্দরাণী হেসে বললে, 'পাগল আর ছাগল সমান মা। ওর শরীরটাই বড়, মনের বয়স একবছরও নয়। নইলে তোমার বাড়ী কাজ করে?'

নন্দরাণী মাকে এমনিভাবে খোঁটা দেয়। নিজে যেন সে বঙ্কুর প্রতি পরমদয়াবতী।

কারো দয়া থাক বা না থাক বঙ্কু এ বাড়ীতে কায়েমী হয়ে রয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে একথাটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে ধমক ছোট জিনিষ,

গালাগালি দিয়েও বঙ্কুকে তাড়ানো যায় না। মাইনে না পেয়ে আধপেটা খেয়েও সে ও-বাড়ীর মাটী কামড়ে পড়ে থাকবে।

নন্দরাণী হেসে বলে, 'পাগলের মর্জ্জি। কিন্তু তাই বলে সবাই মিলে যে ওকে গাল দেবে তা হবে না কিন্তু।' বিমলা এ উপদেশের মর্য্যাদা রাখতে অস্বীকার করলেন। বালতির কাণায় লাগিয়ে কাপড় ছেঁড়ার জন্য একদিন এমন গালাগালি করলেন যে নন্দরাণীকে খুঁজে বার করে বঙ্কু কেঁদেই অস্থির। বঙ্কু বোঝে নন্দরাণী তারই পক্ষে।

অতবড় মানুষটির কান্না দেখে নন্দরাণীর বিষম হাসি পেল। তাকে হাসতে দেখে কান্না থামিয়ে বঙ্কু ভীত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সরে গেল।

হাসি পাক, বঙ্কু তার উপরে নির্ভর করেছে এটুকু নন্দরাণী বোঝে। এর মর্য্যাদা রাখবার জন্য বঙ্কুর সামনে সে মাকে বলল, 'কেন অত বক? তোমার বড় বাড়াবাড়ি মা!'

'বটে!' বিমলা পেটের মেয়ের মুখ-ঝামটা সইলেন না, সমান প্রত্যুত্তর দিলেন। ফলে মা ও মেয়ের রীতিমত ঝগড়া হয়ে গেল।

তার পক্ষ হয়ে নন্দরাণীকে লড়তে দেখে বঙ্কু ভারি খুসী। আনন্দে সে কেবল মাথা চালতে লাগল।

একদিন নন্দরাণী কলঘরে স্নান করছে। এমন সময় বঙ্কুর কাণ্ডে বিমলা একেবারে ক্ষেপে গেলেন। নন্দরাণীর আয়না চিরুনির সাহায্যে চুল আঁচড়াবার সখ বঙ্কুর কেন হয়েছিল বলা কঠিন, কিন্তু সে সখ যে জন্যই হোক আয়নাটা দেয়াল থেকে নামিয়ে ভাল করে মুখ দেখার সখ না চাপলে কোন গোল হত না। বঙ্কুর হাতে নন্দরাণীর ক্রিম মাখা, পিছলে পড়ে আয়নাটা ভেঙে গেল। বিমলা এমন গালাগালি আরম্ভ করলেন যেন আয়নার শোকে আর্ত্তনাদী মড়াকান্না জুড়েছেন।

বড় ছেলে সরোজ জানে কথার মারে মানুষ মরে না। সে বঙ্কুর গালে ঠাস করে চড়িয়ে দিল। বঙ্কু কাঁদ কাঁদ হয়ে কলঘরের সামনে গিয়ে জোরে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করল।

ভেতর থেকে নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

'আমাকে দাদাবাবু মারছে !' বঙ্কুর স্বর কান্নায় ভিজা।

বঙ্কুর গলার আওয়াজ পেয়ে বিষম চটে নন্দরাণী ধমক দিল, 'যা এখান থেকে বজ্জাত কোথাকার।'

ওদিকে বিমলা হাঁকলেন, 'ও সরোজ, ছাখ্ বঙ্কু হারামজাদার কাণ্ড।'

কাণ্ড দেখে সরোজের রক্ত মাথায় চড়ে গেল, বঙ্কুর কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নামিযে দিযে এল একেবাবে রাস্তায়।

'দূর্ হয়ে যা বজ্জাত কাঁহাকা।'

বিমলা বললেন, 'আহা, তাড়িয়ে দিলি কেন একেবারে! তোর বড় রাগ সরোজ। যা ডেকে নিয়ে আয়। মাগনার চাকর মাগনা জোটে ভাবিস্ নাকি ?

'তুমি ডেকে আনগে'।' বলে সরোজ দাড়ি কামাতে বসল।

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দরাণী সদরে গিয়ে পথের দুদিকে উঁকি মেরে দেখল, কোথাও বঙ্কুর চিহ্ন নেই, সে চলে গেছে। রাগে মুখ কালো করে সে ভেতরে এল।

সরোজ বলল, 'যাক যাক, মরুক। স্নানের ঘরের দরজা ঠ্যালে—ব্যাটা বজ্জাত !'

নন্দরাণী বলল, 'দু'ইঞ্চি পুরু দরজা, সেটা মনে রেখো দাদা। মাতব্বরি করা তোমার একটা অতি উৎকট স্বভাব। আমার বেরিয়ে আসার তর সইল না তোমার ?'

'তুই এসে কি করতিস্ শুনি ?'

'তোমায় বলতাম তাড়িয়ে দাও, না হয় মারো ! বলতাম কিছু বোলো না !' দুমদাম পা ফেলে নন্দরাণী চলে গেল।

কিন্তু দেখা গেল এত সামান্য কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার মত মন্দ চাকর বঙ্কু নয়। ঘণ্টাখানেক পরে সে কোথা থেকে এসে নীরবে এঁটো বাসন কুড়োতে আরম্ভ করল আর মাঝে মাঝে ভীত চোখে তাকাতে লাগল নন্দরাণীর দিকে। এই এক ঘণ্টায় তার মস্তিষ্ক এইটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে যে, নন্দরাণীর স্নানের সময় কলঘরের দরজা ঠেলা অপরাধ।

সরোজ হেসে বলল, 'দেখ্‌লি ?'

নন্দরাণী বলল, 'তুমি ভাবছ ও মান অপমান বোঝে না ? বলব চলে যেতে ?'

সরোজ বলল, 'থাক। তুই বললে হয়ত চলে যাবে।'

নন্দরাণী সগর্বে হেসে বলল, 'মানুষ বশ করতে জানা চাই দাদা। শুধু বকলেই হয় না।

সে যেন অনেক চেষ্টায় অনেক তপস্যায় বঙ্কুকে বশ করেছে ; বঙ্কুর বশ্যতা স্বীকারে বিধাতার কোনই হাত নেই ; সবটুকু কৃতিত্ব তারই !

বাইরের চৌবাচ্চায় বঙ্কু কাপড় ধোয়, খানিক পরে ছাড়া-কাপড় আনতে কলঘরে ঢুকে সে আর বেরিয়ে আসার নাম করে না। বিমলা বলেন, 'তোর সাবান মাখছে হয়ত মুখে, রাণী।'

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কলঘরে গেল। দেখল, বঙ্কু সকলের কাপড় বালতিতে তুলে তার ডুরে শাড়ীটা দিয়ে মুখ মুছছে।

'ওকি হচ্ছে বঙ্কু ?'

বঙ্কু তাড়াতাড়ি শাড়ীটা ফেলে দিয়ে ভীত চোখে চেয়ে রইল।

নন্দরাণী বলল, 'ভয়ানক বজ্জাত তো তুই ! আমার কাপড়ে মুখ মুছছিস কেন ?'

বঙ্কুর মুখে কথা নেই।

বঙ্কুর বুদ্ধির জড়তা ক্রমেই কেটে গেল। কাজটা প্রকৃতির, কিন্তু তাতে নন্দরাণীর অজ্ঞাত প্রভাব কি একটুও ছিল না? অবশ্য চাকরের বুদ্ধির জট খুলবার ধৈর্য্য ও ইচ্ছা নন্দরাণীর থাকার কথা নয়। বঙ্কুকে সে পছন্দ করত শুধু এই জন্য যে, বঙ্কু নিজেকে বাড়ীর মধ্যে বিশেষ করে তারই চাকর করে রেখেছিল। সে যেন নন্দরাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাকে নিয়ে যা খুসী করার অধিকার নন্দরাণীর আছে। মুখের কথা খসামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, ব'কে কাঁদানো যায়, মিষ্টি কথায় খুসী করা চলে, এমন একান্ত নির্ভরশীল মানুষকে কে না পছন্দ করে?

কিন্তু বঙ্কুর সহজ বুদ্ধি ফিরে আসার সঙ্গে চারদিকে গোল বাধতে লাগল। বঙ্কুর বিশেষত্ব লোপ পেয়ে এল, তার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে একজন পূর্ণ মানবের মধ্যে শিশুর প্রাণ দেখে এবং সেটা এক শোচনীয় ফল বলে জেনে, তাকে আর অন্যান্য চাকরদের চেয়ে পৃথক করে দেখার আর কোন কারণ রইল না। তার উপরে বঙ্কু নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝে নিতে শিখল এবং একদিন ন' মাসের বাকী মাইনে এক সঙ্গে দাবী করে বসে সকলকে ক্রুদ্ধ ও চমকিত করে দিল।

বিনা পয়সায় নন্দরাণীর কেনা গোলাম হয়ে থাকতেও তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। তার নির্ভরশীলতা গেল শোচনীয় ভাবে কমে। কেউ ধমকালে সে এখন নিজের হয়ে নিজেই লড়াই করে, নন্দরাণীর মুখ চেয়ে থাকে না। নন্দরাণী অন্যায় হুকুম করলে সে গম্ভীর মুখে জানায়, সে অন্য কাজ করছে। নন্দরাণীর জুলুমে বিরক্ত হয়ে এক এক সময় ফোঁস করে ওঠে।

একটা রাজ্য যেন হাত ছাড়া হয়ে গেছে, নন্দরাণীর এরকম জ্বালা বোধ হয়। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু

যে রাজ্য সে নিজের চেষ্টায় জয় করেনি, একবার হারিয়ে নিজের চেষ্টাতেই আবার সে রাজ্য জয় করবে কি করে! সে রাগ চেপে অনুযোগের সুরে বলে, 'তুই আজকাল আর আমার কথা শুনিস্ না বঙ্কু।'

বঙ্কু বলে, 'যেসব অন্যায় কথা, কি করে শুনি। মসলা বাটছি, হুকুম দিলে ঘরঝাঁট দিয়ে যা—একটা মানুষ তো আমি।'

'তবে তুই দূর হয়ে যা এ বাড়ী থেকে।'

'মাইনে চুকিয়ে দাও, এখুনি যাচ্ছি', বলে বঙ্কু রেগে চলে যায়।

শেষে একদিন নন্দরাণীর সঙ্গেই ঝগড়া করে মাইনে না নিয়ে বঙ্কু চলে গেল। বলে গেল, 'আমার মাইনের টাকায় তুমি হার গড়িয়ো দিদিমণি।' একথা শুনে সরোজ তাকে মারতে উঠেছিল, কিন্তু বঙ্কুকে রুখে দাঁড়াতে দেখে গায়ে হাত তোলা আর সঙ্গত বিবেচনা করেনি।'

দুদিন পরে সকাল বেলা কিন্তু বঙ্কু ফিরে এল। নন্দরাণী তখন দাঁত মাজছে।

বঙ্কু ম্লান মুখে বল্‌ল, 'নতুন লোক রেখেছো নাকি দিদিমণি?'

'যদি রেখে থাকি?'

'তাকে ছাড়িয়ে আমায় রাখতে হবে। তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাইনে চাইনে আমি।' কথাটার কদর্থ ক'রে রাগে কাঁপতে কাঁপতে নন্দরাণী উঠে চলে গেল। মাকে গিয়ে বলল, 'শুনছো মা, আমায় ছেড়ে থাকতে না পেরে বঙ্কু ফিরে এসেছে। মাইনেও নেবে না।'

বিমলা বল্‌লেন, 'বেশত'। পাগলের কথায় তুই রাগ করেছিস নাকি?'

নন্দরাণী মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ও পাগল? দেখগে ওর ঘরে আমার শাড়ী আমার জুতো আমার চুল এই সব জড়ো করা আছে। হারামজাদাকে রোজ পা টিপতে দিতাম, ঘুমিয়েও পড়তাম এক একদিন···মাগো!'

'আহা, কি যে সব বলিস !' বলে বিমলা কার্য্যান্তরে গেলেন।

নন্দরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, তারপর কাকে যে মুখ ভ্যাংচাল অন্তর্য্যামী জানেন।

পরের বছর বৈশাখ মাসে নন্দরাণীর বিয়ে হল এক দোজপক্ষ মুন্সেফের সঙ্গে। বিয়ের তিন মাস পরেই সে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল বহরমপুরে।

ঠিক এক মাস পরে বঙ্কু সেখানে গিয়ে হাজির !

নন্দরাণী বললে, 'কিরে বঙ্কু ?'

বঙ্কু বলল, 'মা বড় বকে, তাই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমায় রাখবে দিদিমণি ? আমি মাইনে নেব না।' নন্দরাণীর কোলে স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে, গায়ে একরাশি গয়না, পরণে দামী কাপড়, সিঁথিতে চওড়া সিন্দূর। তার চাল অতি ভারিক্কি—গিন্নির মত এবং বেমানান। সে বলল, 'তা বেশ তো, থাক্ না।'

মুন্সেফ শুনে বললেন, 'আরে না, মাইনে দেব বৈকি ! খাটবে মাইনে দেবনা—ছি।'

নন্দরাণী বলল, 'তোর মাইনে আমাব কাছে জমা থাকবে, কি বলিস বঙ্কু ?'

বঙ্কু বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর দিন কেটেছে মাস কেটেছে বছর কেটেছে অনেকগুলি। নন্দরাণীব ঘর ভরা ছেলে মেয়ে, সে বেজায় মোটা হয়ে পড়েছে। বঙ্কু এখনো তার কাছে চাকরী কবে—বিনা পয়সার গোলামী। তার মাথার মধ্যে কোনও গোল নেই, কিন্তু নন্দরাণীর উপর তার আগের মতই নির্ভরতা, নন্দরাণীর মুখের কথায় মরণ-বাঁচন।

কুড়ি বছরের মাইনে জমা, মুন্সেফ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে

বলেন, 'বঙ্কু যদি এখন সব মাইনে চেয়ে বসে রাণী, তোমায় আমি বিক্রি করব।'

নন্দরাণী হাসে, তারপর নিজের মোটা শরীরটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। গড়ানো চাকা গড়িয়েই চলবে অবশ্য, কিন্তু তবু ভয় করে! চুল পাকতে দাঁত পাকতে আর বাকী কত!

বঙ্কুর কিন্তু চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা।

শৈলজ শিলা

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা মাসীর খোসামোদ করা। মাসী মরিল। সুতরাং জীবনটা উদ্দেশ্যহীন হইয়া গেল।

উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নিয়া কি যে করিব ভাবিয়া পাই না।

বন্ধুবান্ধবের কুপরামর্শে একদা সুপ্রভাতে মেয়ে দেখিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। মেয়ে অবশ্য সুন্দরী, ফিরিঙ্গি স্কুলের প্রবেশিকা ক্লাসেও পড়ে, কিন্তু গৃহস্থঘরের মেয়ে তো?—হবু বরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে মুখ কালো করিবার কি তার অধিকার? সারাদিন রাগে গজ্ গজ্ করিলাম এবং পাশের বাড়ীর কালো মেয়েটাকেই বিবাহ করিব স্থির করিয়া বিকালে ছাদে উঠিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র মুচকি হাসিয়া মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নীচে চলিয়া গেল।

কবে যেন মাদুর পাতিয়া ছাদে শুইয়াছিলাম, কয়েকদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাদুরটা ছাদের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে। মস্ত একটা হাই তুলিয়া ইহার উপরেই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অপরাহ্নের ওই চকচকে আকাশটা যে আয়না নয় এজন্য কত জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কে জানে!

আকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সাঁতার দিতে থাকিলে কোথাও গিয়া পৌছানো যায় কিনা এমনি একটা অবাস্তব চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম;—স্বপ্ন দেখিলাম পাহাড়ের। তরুহীন শস্পহীন ধূসরবর্ণ রাক্ষসের মত গাদাগাদি করিয়া রাখা পাহাড়গুলির চাপে স্বপ্নেই আমার উপত্যকার প্রেম গুঁড়া হইয়া গেল। তিনদিন বাদে পিঠে

বোঁচকা বাঁধিয়া চলিয়া গেলাম দার্জ্জিলিং এবং একদা টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখিয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যেই কয়েকদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহাতে আমার যে কি শাস্তি হইল শুনিলে আপনাদের চোখে জল আসিবে। একঘণ্টার ভিতরে সূর্য্যদেব কোন দিকে উঠেন তাহা তো ভুলিয়া গেলামই, পাক খাইতে খাইতে আমি নিজে কোন্ দিকে চলিলাম তাহার পর্য্যন্ত কিছু স্থিরতা রহিল না। নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা খাড়াইএব উপর তুলিয়া কোন দিকে নামিলে যে হাত পা ভাঙ্গিয়াও প্রাণটা বজায় রাখা যাইবে ঠিক করিতে পারি না, যেদিক দিয়া উঠিয়াছি, সেদিকে নামার কথা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। হাত আর হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, মাস্‌ল্‌গুলি ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল, এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিত গতি প্রত্যক্ষ করিতেছি!

অবশেষে একবার যখন হাত ফস্কাইযা কুড়ি ফিট আন্দাজ গড়াইয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আটকাইয়া গেলান, তখন আর উঠিবার চেষ্টামাত্র না করিযা মনে মনে বলিলাম, থাক যথেষ্ট হইয়াছে। সেইখানে শুইয়া শুইয়া পকেট হইতে বিস্কুটের গুঁড়া বাহির করিয়া মুখে পুরিতে লাগিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাবিলাম, একেবারে শুকনা শিলার গায়ে এই গাছটা গজানো না জানি কোন নিষ্ঠুর দেবতার কীর্ত্তি। ওই তো তলা দেখা যাইতেছে, গড়াইয়া পড়িলেই হইত! জীবনের উদ্দেশ্যটা তাহা হইলে কিছু কিছু বোঝা যাইত নিশ্চয়।

ঘণ্টাখানেক ঝিমাইবার পর উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কোন মতে গাছটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম নিজের

ইচ্ছায় যেটুকু নামি নাই শত ইচ্ছা করিলেও সেটুকু আর উঠিতে পারিবনা। নানাবিধ কসরতের সাহায্যে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই নীচে নামিয়া পড়িলাম।

সোজা হইয়া দাঁড়াতেই দেখি, চমৎকার। ত্রিশগজ তফাতে পাহাড়ী উনুনে একটা ভাতের হাঁড়ি চাপানো রহিয়াছে এবং নিকটে যে রাঁধুনী বসিয়া আছেন তিনি নিঃসন্দেহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

মাতালের মত হেলিয়া দুলিয়া নিকটে গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি এখানে ?'

ভদ্রলোকের মুখ আমসীর মত শুকাইয়া গেল। বলিলেন, 'আজ্ঞে, আপনাকে তো চিনলাম না ?'

হাসিয়া বলিলাম, 'এখানেই জীবন কাটিয়েছেন নাকি ? মানুষ দেখেন নি কখনো ? আমি আপনার মতই মানুষ। এত জায়গা থাকতে এখানে এসে ভাত রাঁধছেন কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পাবার জন্য বুঝি এখানে শুভাগমন করেছেন ?'

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আমার বড় বিপদ মশাই।'

'সে আমারো' বলিয়া বসিলাম। নিকটবর্ত্তী গুহাটায় চোখ পড়িল উনানের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া।

'বাঃ বাঃ, এ যে দেখছি গুহা। আপনি ওখানে তপস্যা করেন নাকি ? পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ করেছেন ?'

'আজ্ঞে না। বিপদ তো ওইখানে।'

শুনিয়া ভদ্রলোকের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গুহায় উঁকি দিলাম। একটি যুবতী মেয়ে মাদুরে শুইয়া বেদনায় কাতরাইতেছে!

ভড়কাইয়া লোকটির কাছে ফিরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলাম, 'এ যে বিষম কাণ্ড মশাই!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ছেলে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?' বলিয়া আমি প্রকাণ্ড একটা হাঁ করিয়া ফেলিলাম এবং বহুক্ষণ অবধি সে হাঁ বন্ধ করিতে খেয়াল হইল না।

যত দুর্গম পথ দিয়াই আমি আসিয়া থাকি এখানে আসিবার একটা সুগম পথও আছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া প্রত্যহ দু'বেলা পাঁচ ছয় মাইল চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ভারটা আমার উপরেই পড়িল। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেজায় কুঁড়ে। দুবেলা রান্না করেন, খান আর গুহামুখে মস্ত একটা পাথরে ঠেস দিয়া বসিয়া চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবেন। একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

গুহা আলো করা একটি মেয়ে হইয়াছে। ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদে চুক চুক করিয়া দুধ খায় আর চোখ বুজিয়া ঘুমায়। আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি।

বলি, 'লোকজন ডেকে এবার লোকালয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যাক, কি বলেন মশায়?'

লোক ডাকার কথা শুনিলে লোকটা কেমন কাঁদ কাঁদ হইয়া যায়, সহরে ইহাদের বিপদের কথা প্রচার করিব বলিলে একেবারে কাঁদিয়া ফ্যালে।

স্ত্রীতো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দশ ঘণ্টা কাঁদিয়াই কাটায়। ভিতরে কিছু গোলমাল আছে বুঝিতে পারি, মেয়েটার চুলপাড় শাড়ী আর সিঁদুর-হীন সীঁথি দেখিয়া সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'আঁতুরে কি সিঁদুর পরতে আছে?' স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে!

বড়ই জটিল ব্যাপার। নকল দুঃস্বপ্নের মত।

দিন দশেক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা-বাপ কাহারো চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়া ছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি ভীষণ। আমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নাম-ধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিযাছে। যুবতীটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন।

পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পলাইযা গিয়া জগতের কল্যাণ করি শেষের দিকে এরূপ একটা অনুরোধও জানানো হইয়াছে।

খুকীকে কোন প্রকারে একটু দুধ খাওযাইয়া আমি মাথায হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুপস্থিত বিধবাটি এবং তাহার বাপের উদ্দেশে আমার গালাগালি শুনিয়া গুহার পাথরগুলিও বোধহয় সেদিন লজ্জা পাইযাছিল।

পনের বছর পরে ভূমিকম্প!

বাৎসল্যের সিমেণ্ট দিয়া যৌবনেব শক্ত গাবদ কবিযাছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির!

মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিযাছিল, এখন আমাব বাড়ীটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই প্রৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

একরাশি কালো চুল পিঠে জড়াইয়া ফর্সা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায, সন্ধ্যাব পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করে, আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি। মেয়েটা যে এত সুন্দর এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে

গিয়া দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙ্গা ঠোঁট আর অপূর্ব্ব-গঠন তনু আমাকে সেইখানে আটকাইয়া রাখে।

রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, 'শিলা!'

সে অবশ্য ঘুমাইয়া থাকে, সাড়া দেয়না, আমার মুখের ডাকে আমারই ভবিষ্যৎ ভূতটা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ এমন আতঙ্ক হয় যে বলিবার নয়। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিযা কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া পড়ি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চুরুট দেশলাই খুঁজিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি চুরুট ধরাইয়া টানিতে গিযা কাসিতে আরম্ভ করিয়া দিই। কাসিতে কাসিতে হাসি পায, আমার হাসির শব্দে অন্ধকার যেন নড়িযা ওঠে, বাড়ীটা যেন বিরক্তিতে একবার একটু কাঁপে, আমার গা যেন ছম্‌ছম্ করে। গলা চাপিয়া হাসি থামাইতে গিয়া গোঁ গোঁ শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি হাত সরাইযা নিয়া আমি উঠিযা বসি।

খোলা জানালায় শব্দ হয়, 'দাদু!'

'কিবে শিলা?'

'আমার ভয় কবছে দাদু। কে যেন হা হা করে' হাসছিল।'

শুনিযা শিহবিয়া উঠি। চৌকীর প্রান্তটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলি, 'ভয় আবাব কিসের? ঘুমোগে যা।'

'আমি তোমার ঘরে শোব দাদু, দরজা খোল।'

মেয়েটা বলে কি! এই নিস্তব্ধ রাত্রি, অনুভূতিতে ঘা-মারা এই গাঢ় অন্ধকার, অর্দ্ধোম্মাদ এই নিদ্রাহীন তৃষিত প্রৌঢ়, এঘরে শুইতে চায় ও কোন্ হিসাবে? রাত দুপুরে জ্বালাতন করিতে নিষেধ করিয়া এমন জোরে ধমক দিয়া উঠি যে, নিজেরই চমক লাগে!

মিনিটখানেক ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া সব স্তব্ধ হইয়া থাকে, তার

পর শুনিতে পাই অবাধ্য মেয়েটা জানালা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই, অধিকন্তু ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলি, ভূত আর আমার ভয়ে শিলা ভাল করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না, দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া জানালার নীচে বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া আমার হৃদয় হিম হইয়া যায় এবং আমি স্পষ্ট অনুভব করি সেখানে অতনুর মূর্চ্ছা হইয়াছে।

ওঘর হইতে বিছানা টানিয়া আনিয়া নিজেই শয্যা রচনা করিয়া দিই। চোখ মুছাইয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া দিতেই শিলা নীরবে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আমি ক্ষণকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকি। খানিক দূরে তেতালা বাড়ীটার মাথা ডিঙ্গাইয়া গিয়া বড় বড় কয়েকটা তারার সংবাদ নিয়া ফিরিয়া আসাব পূর্ব্বেই জলীয় কুয়াসায় আমার দুচোখ আত্মহারা হইযা যায়। ভিজা সেঁতসেঁতে তাহার আর্ত্তি।

পাড়াপ্রতিবেশীরা বলিতে আরম্ভ করিযাছে, 'এবার নাতনীব বিয়ে দাও। অমন টুকটুকে নাতনী তোমার!'

নাতনী টুকটুকে বলিযা নয়, আমার টুকটুকে নাতনী বলিয়া ইহাদেব বিস্মব যেন বেশী! শুনিলে রাগে গা জ্বলিযা যায। আমার তিলোত্তমা বউ থাকা যেন অসম্ভব! আমার সুন্দরী মেয়ে যেন ছিল না। টুকুটুকে নাতনী যেন আমার থাকিতে নাই!

বলি, 'আমার নাতনীর বিয়ের ভাবনা আমিই ভেবে উঠতে পারব মিত্তির মশায়।'

সান্ন্যাল বলে, 'তা অত ভাবাভাবির দরকার কি? তুমি নিজেই বিয়ে ক'রে ফেলনা হে! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এমন শক্ত সমর্থ দাদু—নাতনী তোমার বর্ত্তে যাবে।'

খুসী হইযা সান্ন্যালেব পিঠ চাপড়াইযা বলি, 'তা মন্দ বলনি সান্ন্যাল। আমিও মাঝে মাঝে ওই কথাই ভাবি। একটা বেরসিক ছোঁড়াব হাতে ওকে দিতে আমাব একটুও ইচ্ছে নেই।'

ইহাদেব ভিতব চাটুয্যে লোকটা অতি বদ। বলে, 'না না, এ ঠাট্টার কথা নয। মেযেটি ডাগব হযেছে, এবাব বিযে দেওযা কর্ত্তব্য। আমাদের এই ভূপেনেব সঙ্গে সম্বন্ধ কবনা ?'

ভূপেন ছোঁড়া পাড়াব হৃদয ডাক্তারেব পুত্র এবং পাড়াব মধ্যে বোধ কবি সব চেযে সুপাত্র। অন্দবে ঢুকিতে দিই না, তবু নিত্য আমাদেব এই আড্ডায হাজিব হয। বোধ হয পান জল দিবাব জন্য শিলা যে বাহিবে আসে সেই সময তাহাকে দেখিবাব লোভে। চাটুয্যেব কথায ছোঁড়াব মুখ লাল হইযা উঠিযাছে দেখিযা মনে মনে স্থিব কবিযা ফেলি এবাব হইতে পান জল দিবাব ববাতটা চাকবেব উপবেই থাকিবে।

মখুয্যে চাটুয্যে অপেক্ষাও পাজী। স্মিতমুখে ভূপেনেব দিকে চাহিযা বলে, 'বড ভাল ছেলে, বড ভাল ছেলে। পাড়াব সবগুলি ছেলে এবকম হলে—'

ঠিক এমনি সমযে পান নিযা ঘবে ঢুকিযা শিলা প্রশংসাগুলি সব শোনে। ইচ্ছা হয মেযেটাকে অন্দবে ছুঁড়িযা দিযা লাঠি নিযা সকলকে মোড পর্য্যন্ত তাড়াইযা নিযা যাই আব ভূপেনেব মাথায বসাইযা দিই সেই লাঠি। পুলিশেব হাত এড়াইতে শিলাকে নিযা তাব সেই আঁতুড়েব গুহাতে চিবকাল লুকাইযা থাকি। সেই অপবিসব গুহায ঘেঁষাঘেঁষি হইযা বাত কাটানোব সমর্থন পাইলে আমি কি না করিতে পাবি ?

সকলকে বিদায দিযা ভিতবে গিযাই শিলাকে বলি, 'বিযে কববি শিলা ?'

সে মাথা নাড়িয়া বলে, 'না দাদু বিযে আমি করব না।'

'তবে কি করবি?'

'তোমার কাছে থাকব।'

'তা থাকিস। কিন্তু চিরকাল নাতনী হয়েই থাকবি? বৌ হয়ে থাক না!'

'দূর ছোটলোক!' বলিয়া সে হাসে।

তাহার মুখ হইতে যে দৃষ্টি সরাইতে পারি না, তাহা এমনি মুখর যে চক্ষু মার্জ্জনার ছলে ঢাকিয়া দিতে হয়। আপশোষ করিয়া মরি যে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিযা ওর দাদু হইয়া স্নেহ শিখাইয়াছি, স্বামী হইযা প্রেম শিখাই নাই। আজ তাহা হইলে--

চিন্তাটা বড় জটিল। আমার স্নেহের পুত্তলী আমাকে এমনভাবে ঠকাইবে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল?

ইচ্ছা হয় জন্মের কাহিনী শুনাইয়া মেয়েটাকে ভাঙিয়া দিই। উহার মুখের নিষ্পাপ সরলতা ঘুচিয়া গিয়া আমার পথ পরিষ্কার হোক।

'মার কথা শুনবি শিলা?'

'বল দাদু!'

আমি বলিতে আরম্ভ করি। গুহার আবছা আলোয় শিলার জন্মকথা। কিন্তু যতবারই বলি আসল বক্তব্যটা গোপন থাকিয়া যায়, শেষ করি একটা মিথ্যা বলিয়া। অযত্নে অচিকিৎসায় ঠাণ্ডায় না-দেখা মার শোচনীয় মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া শিলার চোখ দিয়া জল পড়ে!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বদমাইস ত কোনদিন ছিলাম না, পারিব কেন! অন্যায় করিবার অক্ষমতায় আত্মপ্রসাদ জন্মে, যথালাভ মনে করিয়া তাহাতেই খুসী থাকিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু পারিলাম। শিলাকে চুম্বন করিবার মত অবস্থাটা কিছুকালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া গেল। কেমন করিয়া গেল তাহা এত বেশী সূক্ষ্ম যে

ভাষায় মোটা ইঙ্গিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার দুঃখে কলম ছুঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিলার বয়স আর পনের নাই, ষোল হইয়াছে।

কিছুকাল হইতেই দেখিতেছি সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি-এক না-জানা ভয়ে চোখ দু'টি চঞ্চল। মুখ যেন বর্ষণহীন শ্রাবণের আকাশ, ক্রমাগতই কালো কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সকালবেলা আমি টাকা-পয়সার হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকি, মুখ তুলিতেই দেখি একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ মুখভঙ্গি করিয়া সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আমাকে চাহিতে দেখিলে সরিয়া যায়।

আমার হিসাব যায় গুলাইয়া, ডাকি, 'শিলা শোন্।'

আমি ডাকিলেই শিলা দুড়দাড় ছুটিয়া আসিত, এখন এমন মন্থর-গতিতে আসে যেন পদে পদে পা বাধিয়া যাইতেছে। খানিক তফাতে থাকিয়াই বলে, 'কি দাদু ?'

'কাছে আয়।'

শিলা কাছে আসেনা, আসিতে থাকে! নাগালের মধ্যে আসিলেই খপ্ করিয়া তার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া দিই। বলি, 'তুই বড় লক্ষ্মী মেয়ে শিলা।'

শিলা জোর করিয়া একটু হাসে। বলি, 'আমাকে তুই ভালবাসিস শিলা ?'

পরম আশ্বস্ত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'বাসি দাদু। ঘামাচি মেরে দেব বুঝি ?'

সুতরাং ওইখানেই থামিতে হয়, যদিও সেই থামার অর্থই নেপথ্যে অগ্রসর হওয়া। বলি, 'ঘামাচি কইরে ? আমার আর ঘামাচি হয় না। দু'বেলা কত সাবান মাখি তা জানিস্ ?'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া শিলা বাঁচে এবং ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সে আগের মত হাসিখুসী হইয়া কাটায়। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু সাময়িক পরিবর্ত্তনটাকে তাহার নিকটেও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। তাহার শঙ্কা-সঙ্কোচহীন জীবন-প্রবাহ আবার অবাধে বহিতেছে দেখিয়া আমিও এদিকে ঝিমাইয়া পড়ি। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ও-মেয়েটার নারীত্ব যে আবার ঘুমাইয়া পড়ে ইহা আমার ভাল লাগে না।

আবার আমার অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পীড়ন চলে। হাসিখুসী মিলাইয়া গিয়া তাহার কপোল হয় পাণ্ডুর, চোখ করে ছল্‌ছল্‌!

এমনি ভাবে দিন যায়, অবশেষে একদিন বর্ষা-ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে আমার এই পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়া শিলার হাসিখুসী চিরকালের জন্য মুছিয়া নিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু দেখিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

'কি দাদু?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল!

কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনীর ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সঙ্গত ব্যাখ্যাই ছিল। চুম্বন যে লভ্‌ রাইট-এর সভ্যসংস্করণ একথা আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট!

ছুটিয়া রাস্তায় পড়িয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া পূরা দুই মাইল হাঁটিয়া থামিলাম। পথের ধারে একটা নির্জ্জন গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর কত ঘণ্টা পরে বাড়ী ফেরা চলিবে।

হঠাৎ খেয়াল হইল একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই হাতের ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখে কি যেন খুঁজিতেছেন। ভাল করিয়া নজর করিতে চিনিলাম।

'আপনি যে! এখনো বেঁচে আছেন দেখছি। বলি, এবারও বিপদ নাকি? এ কিন্তু লোকালয় মশায়!'

'আজ্ঞে বিপদ নয়। সে বেঁচে আছে? বলুন, সে বেঁচে আছে?'

মাথা নাড়িয়া শূন্যে তুড়ি দিয়া বলিলাম, 'বাঁচে কি? আপনিই বলুন! মৃত্যুই যে পৃথিবীতে একমাত্র সত্য! আপনি আমি বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য্য। আহা, ওখানে বসবেন না মশাই!'

লোকটা মাথায় হাত দিয়া পথেই বসিতে যাইতেছিল, আমার অনুরোধে বসিল না। বলিল, 'মেয়েটা পনেব বছর ধরে' পাগল হযে আছে, আপনাকে সেই থেকে খুঁজছি। দুর্গা দুর্গা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল!'

বলিলাম, 'তাই হয়। ওজন্য দুঃখ করবেন না। ষোল বছর পরিশ্রম ক'বে প্রিয়াব মন খুঁজে পেলাম না, আপনার তো মানুষ খোঁজাব তুচ্ছ পরিশ্রম।'

লোকটাকে ফাঁকি দিবাব জন্য নানা বাস্তা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিলাম। দেখি, শিলা আমাব জন্য ময়দা মাখিতেছে! মুখখানি তার যেমন বিষণ্ণ তেমনি শান্ত।

একগাল হাসিয়া বলিলাম, 'আমি ভাবলাম, তুই রাগ করেছিস্ শিলা।'

সে মুখ কালো করিয়া বলিল, 'খেতে দিচ্ছ, পবতে দিচ্ছ, রাগ আর কি ক'বে করি দাদু!'

আপনাবা শুনিলেন? খাইতে পরিতে দিই বলিয়া আমি যেন কত জোর খাটাই! জোব খাটাইতে পাবিলে আমাব ভাবনা কি ছিল বলুন তো?

উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আধ ঘণ্টা পরে ক্ষুধার তাগাদায় শিলাকে তাগাদা দিতে নীচে নামিয়া দেখি, সে তখনো লুচি ভাজিতেছে আর সলজ্জে অদূরে দাঁড়ানো ভূপেনের প্রশ্নের জবাব দিতেছে। আমি

বাড়ী না থাকিলে আমাকে ডাকিতে আসিয়া ছোঁড়া সদর হইতে শিলার সঙ্গে দুই-চার মিনিট কথা কহিয়া যায় সম্প্রতি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে অন্দরে চড়াও হওয়া !

আমাকে দেখিয়া দু'জনেই খাসা লজ্জা পাইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল দাদু।'

'তা আমাকে ডাকলেই হ'ত !' বলিয়া সটান বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম। এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও কি ছোঁড়া বুঝিতে চায় ! হাঁক দিয়া বাহিরে ডাকিয়া আনিলাম, তবে শিলার সঙ্গে তার গল্প ফুরাইল। বেহায়া !

'কি কথা বল্‌তে চাও শুনি ? চটপট বল।'

মুখ লাল করিয়া কোনমতে কথাটা বলিতেই চটিয়া উঠিলাম,—'বটে ! তা বিয়ে ক'রে ওকে খাওযাবে কি শুনি ? এম-এ ডিগ্রির ডিপ্লোমাখানা ?'

ছোঁড়া যে ইতিমধ্যে সাড়ে তিনশ' টাকার চাকরী বাগাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, আমি কি সে সংবাদ রাখি ? প্রথমটা বেশ ভড়কাইয়া গেলাম, কিন্তু মুহূর্তে সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, 'তা হোক্, তোমার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব না।'

'কেন দাদু ?'

সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব কেন হে বাপু ? বাধা আছে এইটুকু শুনে রাখ, বলিয়া আমি ফের রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম !

দিন চারেকের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শিলাকে বলিলাম, 'তল্পী বাঁধ শিলা, এখানকার বাস তুলতে হ'ল।'

শিলা সজলচোখে বলিল, 'কেন দাদু ? বেশ তো আছি এখানে ?'

বেশ থাক আর যাই থাক, পরের দিন জিনিসপত্র সব গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া শিলাকে ভিতরে বসাইলাম। কিছু ফেলিয়া গেলাম কি না দেখিতে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ীর ভিতরে গিয়াছি, ইহার মধ্যে ভূপেন আসিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়াছে।

শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, 'ভূপেন যে! আমরা ত চললাম।'

'একটা কথা শুনুন দাদু' বলিযা সে আমাকে একান্তে নিয়া গেল।

'কোথায় যাচ্ছেন? শিলাও জানে না বললে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'কোথায় যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে! কোন গুহা টুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।'

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিযা ভূপেন বলিল, 'আপনার মত কি কোনদিন বদলাবে না দাদু? এ বিয়ে না হ'লে আপনাব নাতনীও অসুখী হবে।'

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'দ্যাখো বাপু কবি, তোমায় একটা সৎ উপদেশ দিই। শুধু কাব্যচর্চ্চা কবে' জীবনটা মাটি করো না। জীবনে আরও ঢেব বড় বড় সাধনার সুযোগ আছে।' বলিযা গাড়ীতে উঠিয়া পাড়িলাম। আমাব সামনেই শিলা যতক্ষণ দেখা গেল ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিযৎ আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিযা আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেযে বড় একথা মানা আমাব পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুসী হন, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব! বিলাইয়া দিবার জন্য এতকষ্টে এতযত্নে আমি ওকে মানুষ

করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশী কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায় বিচার করিবেন।

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি আমার ভালবাসাও তেমনি। দেড়শ' কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালবাসাও তেমনি মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা তরুর মত—শাখা নাই কিশলয় নাই পাতা নাই ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নীচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখী মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দু'দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিশাইব এ প্রেম তখনো পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তা' ছাড়া শিলার পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওর বিধবা মাকে আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারি না। তার সেই শুভ্রবাসা শীর্ণা-ক্রন্দসী মাতা আমার মনে একটা স্পষ্ট প্রেরণার মত জাগিয়া আছে। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলার মত, সেই কলঙ্কিনী মাতার কন্যা আমার প্রেমেরই যোগ্য এই অন্ধ যুক্তি আমি ঠেলিয়া দিতে পারি না।

পশ্চিমে একটা সহরের প্রান্তে নিরালা বাগান বাড়ীতে শিলাকে নিয়া নীড় বাঁধিয়াছি। রোমান্স একেবারে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনি সেবা

কবিতেছে। পবিহাস কবিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিযা তাকায, হাত ধবিযা সোহাগ কবিতে গেলে কাগজেব মত সাদা আব পাথবেব মত শক্ত হইযা ওঠে।

ইঙ্গিতে বলি, 'বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই শিলা।'

সে বলে, 'মবাটাও তো কঠিন নয দাদু।'

তা বটে। বলি, 'তবু যাব আব অন্যথা নেই তাকে মানতে হয।'

সে বলে, 'জানি। কিন্তু মানাব পথটা আমি তোমাব কাছে শিখব না দাদু। দবজায দাঁডিযে থাকলে আমি কি কবে বাইবে যাই বল ত ?'

দিনেব ব্যাপাবটা এখন এই বকম দাঁডাইযাছে। বাত্রিব ব্যাপাব অন্যরূপ।

বাহিবে কোনদিন জ্যোৎস্না থাকে, কোনদিন থাকে না, কোনদিন বৃষ্টি পড়ে, কোনদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিযা বিছানায উপুড হইযা পডিযা থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সেজন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘবেব বাতাস যেন নিশ্বাসেব পক্ষে অপ্রচুব হইযা পডে। উপবে কাঁটা নীচে কাঁটা দিযা কে যেন আমাকে জীবন্ত কবব দিযাছে মনে হয।

তাবপব এক সময পা টিপিযা টিপিযা গিযা শিলাব দবজা ঠেলিযা বলি, 'তোব আজকাল ভয কবে না কেন শিলা ?'

'চব্বিশ ঘণ্টাই তো ভয কবে দাদু।'

'তবে দরজা খোল। ভয মিটিযে নে।'

শিলা কঠিনস্ববে বলে, 'ঘুমোও গে যাও দাদু। এমন যদি কর, যেদিকে দুচোখ যায চলে যাব।'

নিজেব ঘবে ফিবিযা গিযা দুই হাতে বুক চাপিযা শুইযা পডি। শৈলে যাব জন্ম শিলা যাব নাম সে শিলাব মত শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিবকাল বসে ডুবাইযা বাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিযা মাথা গবম হইযা ওঠে।

খুকী

যার ভাল নাম কাদম্বিনী তার ডাকনাম সাধারণতঃ হয় কাদু অথবা কাদি। দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কাদম্বিনী তাব ভাল নামের এই দু'রকম ভাঙা সংস্করণেই সাড়া দিত। তারপর হঠাৎ একদিন সে সাড়া দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবাদ নয়, রাগ করাও নয়, ডাক নাম দুটি যে সে পছন্দ কবে না সে কথা ঘোষণা করা নয়, একেবারে সাড়া না দেওযার অসহযোগ! 'কাদু! ও কাদু! ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল, শুনতে পাস্ না? এই কাদি!'

কে সাড়া দিবে? এ বাড়ীতে কাদুও কেউ নাই, কাদিও কেউ নাই।

সেই হইতে তাকে খুকী বলিযা ডাকা হয়। প্রথম প্রথম লোকের মনে থাকিত না, পুবানো নামে তাকে ডাকিযা বসিত। কাদম্বিনী ভুলিয়াও সাড়া দিত না। নাম যেন তার ছেলেমানুষীর চেযে বড় ছিল— নিত্য ব্যবহার্য্য তুচ্ছ ডাক নাম! এখন, ষোল বছর বযসে (সতর হওযা আশ্চর্য্য নয, আঠারও হইতে পারে) খুকী নামটাও সে অপছন্দ কবিতে আরম্ভ কবিয়াছে। কিন্তু একজন মানুষ আর কতবাব সামান্য ডাকনামের জন্য চুপচাপ গোলমাল বাধাইতে পারে? বুড়ো বযসে সেটা ভালও দেখায় না। তা ছাড়া, এ বাড়ীর বাস সাঙ্গ হইতেই বা তার কত দেরী। ছ'মাস এক বছরের জন্য অত হাঙ্গামা কবা হাঙ্গামার অপচয়।

রঙ একটু ময়লা কাদম্বিনীর, মুখখানাও দেখিতে তেমন সুশ্রী নয়, তবে দেহের গঠনটি তার সুঠাম। এক কথায় বোঝান যায় না এ রকম।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে সচরাচর চোখে পড়ে না এরকমও বটে। এটা রূপের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। মেয়েদের যে রূপ ভদ্রলোকদের চোখে পড়ে সেটা থাকে তাদের মুখে আর চামড়ায়—চামড়াতেই বেশী। জন্মানোর আগে ভৌতিক আত্মারা সত্যম শিবম সুন্দরমের জ্যোতিতে অন্ধ হইয়া থাকে—নয়তো কালা আদমি আর মেয়েদের 'ফর্সা কর, ফর্সা কর' আবেদনের কোলাহলে জন্মদাতার কান কালা হইয়া যাইত। মেয়েদের স্বাস্থ্যও অনুমোদনযোগ্য, ভদ্ররকমের রোগবিহীন হৃষ্টপুষ্টতা। গঠন আর স্বাস্থ্য আলাদা। শরীর ভাল থাকা স্বাস্থ্য, গঠন—? সম্ভবতঃ সেটা শরীরের বজ্জাতি, কারণ বজ্জাত লোক ছাড়া ওটা আর কারও দ্রষ্টব্য নয়।

কাদম্বিনীর বাবা ডাক্তার অসমঞ্জ রক্ষিত কিছুদিন হইতে মেয়েকে ভাল ভাল ছেলের বাপ দাদা খুড়ো জ্যাঠা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সামনে হাজির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে লক্ষ্য ছিল উঁচু, আশা মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায় কিনা। কিন্তু সমাজেব উঁচু স্তরের লোকেরা এত ঠাণ্ডা আর ভদ্র আর মার্জ্জিতদৃষ্টিসম্পন্ন যে কাদম্বিনী ঘরে ঢোকা মাত্র বিতৃষ্ণায় তাদের যেন মাথা গরম হইয়া ওঠে, একটা প্রাগৈতিহাসিক অভদ্রতায় অপমান বোধ হয়, ফাটা চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া তাকানোর মত দু'চোখে ধারালো রেখার সূক্ষ্ম পীড়ন সুরু হয়। দোষটা বাড়ীর লোকের। তারা কাদম্বিনীকে না-সাজানোর আধুনিক ফ্যাসানে সাজায়। শাড়ীর প্যাঁচে, এলোচুলের ঔদ্ধত্যে এবং আরও কতকগুলি খুঁটিনাটিতে কাদম্বিনীর বৈশিষ্ট্য হয়। চৌকাঠ পার হইয়া কয়েক পা হাঁটিয়া কাদম্বিনীকে বসিতে হয়। তার সেই চলন ও বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় পুকুরে যেন একটি সমুদ্রের ঢেউ আসিয়াছে।

কাদম্বিনীর মুখের একটি সম্পদ এই উপযুক্ততার পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরিণত হয় তার একটি অতিরিক্ত বিপদে। মুখের শিশুসুলভ সরলতার

ছাপ। অজানা দর্শকদের সন্দিগ্ধ মনে এটা তার মৌখিক অভিনয়ের মত খাপছাড়া ঠেকে, কাদম্বিনীকে তারা ফেলিয়া দেয় বর্ণচোরা আমের পর্য্যায়ে। মুখের কচিত্ব পাকামির আবরণ, চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি প্রবঞ্চনার কৌশল।

বাস্তবতার ভাবে সকলের আশাও সুতরাং মুইতে মুইতে এখন মাটি ছুঁইয়াছে। কেরাণী, স্কুলমাষ্টার দ্বিতীয়পক্ষ প্রভৃতির স্তর। জীবনের অসংখ্য সংস্করণের সবগুলি ভূমিকায় মনতাব ভাবপ্রবণতা সার্থক করিতে চাহিলে চলিবে কেন? তাই, এবার কাদম্বিনীকে একজনের পছন্দ হওয়ার পর বাড়ীর লোক হাসিলও না, কাঁদিলও না।

কাদম্বিনী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে মধ্যস্থ ব্যবহার করিলে গোলমালও বেশী হয়, সময়ও নষ্ট হয়। তার চেয়ে সব কলকাঠি যার হাতে সোজাসুজি তার কাছে যাওয়াই ভাল। যতই হোক, সে তার বাপেরই আদুরে মেয়ে। লোকে আহ্লাদী পর্য্যন্তও তো বলিতে ছাড়ে না।

অসমঞ্জ রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিলেন। কাদম্বিনী গিয়া বলিল, 'একটু পরে রোগী দেখতে যেও বাবা। আমার একটা দরকারী কথা শুনে যাও।'

মেয়ের দরকারী কথা শুনিয়া অসমঞ্জ থতমত খাইয়া গেলেন।

'মাথামুণ্ডু কি যে বলিস ঠিক নেই। চিঠির জবাব দেব না? পছন্দ ক'রে চিঠি লিখেছে, জবাব দেব না কেন?'

'লোক ভাল নয় বাবা।'

'লোক ভাল নয়! তুই কি করে জানলি লোক ভাল নয়?'

বাপের মুখের উপর একথার জবাব দেওয়ার মত বেহায়া বা আহ্লাদী বা সরলা বা খুকী মেয়ে কাদম্বিনী নয়। মধ্যস্থ শেষ পর্য্যন্ত তাকে মানিতেই হইল। কৈফিয়ৎ সে দিল পিসতুতো দিদি শান্তিলতার কাছে।

'লোকটা ভারি বদ শান্তিদি। বিচ্ছিরি ক'রে তাকাচ্ছিল।'

'বিচ্ছিরি ক'রে তাকাচ্ছিল মানে কি ভাই খুকী? তুই কি ওর তাকানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলি? তাকানি দেখে কি ক'রেই বা বুঝলি সে বদ লোক?'

শান্তিলতা সাতবছরের পুরানো বৌ, কিন্তু সুখ অথবা দুঃখের বিষয়, তার শ্বশুরবাড়ী নাই। স্বামী তার এত কম রোজগার করে যে এ বাড়ীর সকলকেই তার খাতির করিয়া চলিতে হয়। এমন শিথিল, তামাসা-বর্জ্জিতা, কথা-শোনা, মন-রাখা মেয়ে সে, যে, বৌদির চেয়ে তার কাছেই মনের কথা বলা সহজ।

'বিচ্ছিরি চেহারা, বিচ্ছিরি তাকানি, গরীবের একশেষ; ওকে আমি—'

শান্তিলতা মীমাংসিত সমস্যায় স্বস্তি বোধ করিল।

'তাই বল্ তোর পছন্দ হয় নি! গরীব তো নয় ভাই খুকী? একশো বারো টাকা না কত মাইনে পায় যে!'

'পাক্। ওর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় আমি তাহলে গলায় দড়ি দেব, নয় বিষ খাব, নয় কাপড়ে আগুন ধরিয়ে—'

শান্তিলতার কাছে মাসে মাসে একশো বারো টাকা অনেক, অনেক। কাদম্বিনীর অপছন্দ, সজল চোখ আর সাংঘাতিক নভেলি কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। এমন বোকা ছেলেমানুষ সরল মেয়ে না হইলে কারো মুখ এমন কচি খুকীর মত হয়?

'ছি ভাই খুকী, এসব কথা কি বলতে আছে?'

কি বলিতে আছে আর কি বলিতে নাই সেটা নির্ভর করে যে বলে তার বুদ্ধি বিবেচনার উপরে। কাদম্বিনী চোখ পাকাইয়া বলিল, 'ছি? ছি, শান্তিদি? তোমরা আমায় ধরে বেঁধে—'

কথা শেষ না করিয়া কাদম্বিনীর ঢোক গেলার রকমে শান্তিলতার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ধরে বেঁধে

নয় খুকী। ক'দিন থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে, এক জায়গায় বিয়ে তো হওয়া চাই? এ সম্বন্ধ মন্দ কি, একশো বারো টাকা—'

"রাখো তোমার একশো বারটাকা।'

'উনি বলছিলেন—কাল মাথা ধরে আমার ঘুম আসেনি কিনা তাই অনেক রাত পর্য্যন্ত দুজনে কথাবার্ত্তা বলাছিলাম—উনি বলছিলেন, এখানে বিয়ে হ'লে খুকী খুব সুখী হবে। বি-এ পাশ, একশো বারো টাকা মাইনে—'

কাদম্বিনী হাই তুলিয়া বলিল, 'আমি কিছু শুনতে চাই না শান্তিদি। আমি কি ফেল্না যে একটা বি-এ পাশ হাড়গিলে—একশো বারো টাকায় কি হয় মানুষের!'

সৌম্য নামে যার জন্য এই বিদ্রোহ সে-ও কম হাড়গিলে নয় এবং ছ'মাস ওকালতি করিয়া বারোটা টাকাও সে রোজগার করিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার বাবার এত টাকা আছে যে তিনি ভয়ানক কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও সৌম্য সিল্কের পাঞ্জাবী গায় দেয় আর একটা সিগারেট ফুঁকিয়াই প্রায় তিনটা পয়সা ধোঁয়া করিয়া উড়াইয়া দেয়। মাঝে মাঝে অসমঞ্জের মধ্যবিত্ত সংসারের বিশৃঙ্খল আবর্ত্তের মাঝখানে আসিয়া হাজির হয় এবং অকৃত্রিম প্রসন্নতার সঙ্গে আগাগোড়া ঘরের ছেলের মত ব্যবহার করিয়া যায়। বড়লোকের ছেলের এই অনুগ্রহ এখনো এ বাড়ীর লোক সময় সময় বিশেষভাবে উপভোগ করে। কারণ, অনেকদিন হইতে ঘরের ছেলের মত ব্যবহার করিয়া গেলেও বড়লোকের ছেলে চিরকাল বড়লোকেরই ছেলে।

কাদম্বিনীর সতর আঠার বছর ধরিয়া বড় হওয়ার ফলাফল প্রথম যেদিন একসঙ্গে সৌম্যের চোখে পড়িল, সেদিন সকালে তার বড় মাথা ধরিয়াছিল এবং এ্যাস্‌পিরিন গিয়াছিল ফুরাইয়া। দু'কাপ চা খাইয়াও

মাথা ধরা না কমায় বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় সে গেল অসমঞ্জবাবুর বাড়ী। কাদম্বিনীকে দেখিয়া মাথা ধরা কমানোর জন্য নয়, এ্যাস্‌পিরিনের জন্য। চাকরকে পাঠাইয়া দিলেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঔষধটা আসিত, তবু সে যে নিজেই কেন গেল তার কোন কারণ নাই। এ রকম কারণ-বিহীন তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া বড় বড় ওলোটপালট ঘটে বলিয়া অনেকে একে বলে ভবিতব্যতা। সেটা সঙ্গত নয়। কারণ, আজ সৌম্যের মাথা না ধরিলে, বাড়ীতে এ্যাসপিরিন থাকিলে অথবা চাকরকে এ্যাসপিরিন আনিতে পাঠাইলেও দুদিন পরে যে কাদম্বিনীর দিকে তার চোখ পড়িত না তার কোন প্রমাণ নাই। সে তো অন্ধ নয। বড় বড় চোখ আছে তার।

অসমঞ্জবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। বাহিরের ডিস্‌পেনসারী হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সৌম্য ভিতরে গেল, কাদম্বিনীকে ডাকিয়া হুকুম দিল, খুকী, জল দে তো আমাকে একগ্লাস, ওষুধ খাব।

কাদম্বিনীর দুই দাদা অফিস, এক ভাগ্নে কলেজ, ও আরও দুই ভাই স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় একসঙ্গেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংসারের আবর্ত্ত এখন চরমে উঠিয়াছে সত্য, তবু সৌম্যের হুকুম অনেকগুলি প্রতিধ্বনি তুলিল। রান্নাঘর হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন সে ওষুধ খাইবে, কলতলায স্নানরতা বড়দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি ওষুধ খাইবে, স্বামীর কাপড় গামছা হাতে সামনে দিয়া যাইতে যাইতে একটু দাঁড়াইয়া বড়বৌ বলিল—সর্দ্দির জন্য মাথা ধরিয়া থাকিলে সে ইউক্যালিপ্টাস শুঁকুক না, আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে টাঙানো আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে মেজদাদা মন্তব্য করিল যে মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যায, এত ওষুধপত্র খাওয়া কি জন্য।

কাঁচের গ্লাসে জল আনিয়া দিয়া একটু হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, 'আবার মাথা ধরেছে ? কি বিচ্ছিরি মাথাটা তোমার !'

এই হাসি আর মন্তব্যের সুর তার পরিচিত খেয়াল করিয়া ঝিমানো ভাব কাটিয়া গিয়া সৌম্য যেন হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। একটা বিশেষ বয়সেই শুধু মেয়েরা ঠোঁটের নূতন পাওয়া খেলনার মত এই হাসিকে লইয়া খেলা করে, নূতন শেখা গানের সুরের মত মুখে সব সময় শোনা যায় এই কথা, এই সুর। কাদম্বিনী যে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে সে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বুড়ো ধাড়ী পাকা ঝানু মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, এ জগতে তার যে আর কিছুই জানিতে বুঝিতে অনুভব ও কল্পনা করিতে বাকী নাই, এতদিন যে তার জীবনের আসল সমারোহ সুরু হইযাছে—এটা তার ঘোষণা মাত্র ! কাঁচা আমে প্রথম রং ধরার মত—বর্ণচোরা আম ছাড়া, এ সঙ্কেত কাদম্বিনীর ব্যক্তিগত মৌলিক সম্পত্তি নয়, একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কাদম্বিনীর সর্ব্বাঙ্গে ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী স্থূল ও সূক্ষ্ম ঘোষণা অনেক আসিয়াছে। তবু, এ্যাস্‌পিরিনের বড়ি দু'টা গিলিয়া সৌম্য খানিকক্ষণ এমনভাবে শুধু কাদম্বিনীর মুখখানাই দেখিল যে তার হাসিটা গেল মিলাইয়া। তখন সৌম্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল সম্পূর্ণ কাদম্বিনীকে।

কাদম্বিনী একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, 'রাগ হ'ল নাকি ? সত্যি খুব মাথা ধরেছে ?'

সৌম্য বলিল, 'টন্‌.টন করছে মাথাটা।'

কাদম্বিনী বিজ্ঞের মত নির্ভয়ে হুকুম দিল, 'আজ আর কোর্টে গিয়ে কাজ নেই তবে।'

একটিমাত্র নিশ্বাস ফেলিবার অবসরটুকুর আগে ভয়ে এবং পরে নির্ভয়ে কাদম্বিনীকে কথা বলিতে শুনিয়া সৌম্যের আর

কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। একটু ভাবিয়া সে বলিল, 'না, কোর্টে যাব না।'

কাদম্বিনী খুসী হইয়া বিজ্ঞতা বিসর্জ্জন দিয়া আবার একটু হাসিল।

'মক্কেল আসে না একটা, কেন যে রোজ কোর্টে যাও! চুপচাপ শুয়ে থাকো খানিকক্ষণ, মাথা ধরা সেরে যাবে!'

সৌম্য হাসিয়া বলিল, 'সকালবেলা শোব কিরে খুকী, এইতো উঠলাম সারা রাত শুয়ে থেকে।'

'সকাল বেলা মাথা ধরাতে পার, শুতে পারবে না? ডাক্তারের মেয়ে আমি, আমার পরামর্শ শোন সমুদা, ওপোরে গিয়ে শুয়ে থাক। ওপোরে কেউ নেই, চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারবে। চলো তোমাকে বিছানা পেতে দিচ্ছি।'

চুপচাপ শুইয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার লোভে সৌম্য জীবনে কখনো এ বাড়ীতে আসে নাই, নিজের বাড়ীতে এ সুযোগ তার দুর্লভ নয়। এ বাড়ীর চেয়ে তার নিজের বাড়ীতেই বরং লোকের ভিড় কম। লোভ ও লাভের হিসাব বাদ দিলেও এ সময় কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতালায় গেলে অনেকেই তা লক্ষ্য করিবে এবং কারণ জানিতে চাহিবে। ওষুধ খাওয়ার জন্য কাদম্বিনীর কাছে জল চাওয়ায় সকলের মধ্যে যে কৌতূহল জাগিয়াছিল মাথা ধরার কৈফিয়তে তা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। একশ' গজ দূরে নিজের বাড়ীতে গিয়া শোয়ার বদলে কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতালায় শুইতে যাওয়ার কৈফিয়ৎ হিসাবেও ওটা সকলে গ্রহণ করিবে বটে কিন্তু কে জানে কারো মনে মৃদু একটু খুঁতখুঁতানি জাগিবে কিনা, কেউ ভাবিবে কিনা এটা তার কাদম্বিনীকে দোতালায় লইয়া যাওয়ার ছলনা মাত্র।

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া সৌম্য গলা নামাইয়া বলিল, 'তুই একবার ও-ঘরে যা তো খুকী, ভাঁড়ার ঘরে।"

কাদম্বিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন?'

'যা বলছি, শোন্। যা।'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাদম্বিনী ভাঁড়ার ঘরে চলিয়া গেল। সব বুঝিবার বয়স তার হইয়াছে বটে, সৌম্যের আজকের হেঁয়ালি বুঝিবার ক্ষমতা তার নাই। পেট মোটা কাঁচের জারের ঢাক্‌নি খুলিয়া এক খাব্‌লা কুলের আচার লইয়া সে খাইতে আরম্ভ করিল। বাবুমশায় তো হুকুম দিলেন এ ঘরে আসিবার, এখন সে করিবে কি? হাসিবে? না, কাঁদিবে?

কাজের ফাঁকে বড়বৌ ইতিমধ্যে সৌম্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'কাল বিকেলে আমারও যা মাথা ধরেছিল ভাই সমু ঠাকুরপো, কি আর বলব। উনি তো ভেবেই অস্থির, ওডিকলোন-টলোন কত কি যে দিলেন ঠিক নেই। ক'বার হাঁচলাম রাত্রে, তাতে উনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন। সকালে উঠেই দেখি ভীষণ সর্দ্দি হয়েছে। ইউক্যালিপ্টাস শুঁকে শুঁকে একটু আরাম পাচ্ছি। শুঁকবে?'

ধরা মাথাটা নাড়িয়া সৌম্য বলিল, 'না আমার সর্দ্দি হয় নি।'

দাড়ি কামানো সাঙ্গ করিয়া কাদম্বিনীর মেজ ভাই ভূপেন কাছে আসিল। বলিল, 'তোর এত মাথা ধরে কেন রে?'

সৌম্য বলিল, 'কি জানি। কাল সারারাত ঘুমোইনি। এমন বিশ্রী লাগছে শরীরটা! ভাবছি কোর্টে না গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি।'

'তাই থাক, খানিকক্ষণ ঘুমোলেই হয়ত ক'মে যাবে।'

সৌম্য চিন্তিতমুখে বলিল, 'নিজের বুদ্ধিতে এ্যাসপিরিন খেলাম, কি রকম যেন ক'রছে শরীরটা। জ্বর আসছে কিনা বুঝতে পারছিনা।'

ভূপেনও চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তবে এক কাজ কর, এখানেই শুয়ে

থাক, বাবা ফিরলে বাবাকে দেখাস।—তাড়াতাড়ি কামাতে গিয়ে গালটা কতখানি কেটেছি দেখেছিস্?'

সৌম্য বলিল, 'টিনচার আইডিন দে। ওপোরে গিয়ে শুয়ে পড়ি, কি বলিস্? একটা বিছানা—'

ভূপেন হাঁকিয়া বলিল, 'খুকী, ও খুকী, সমুকে একটা বিছানা ঠিক করে দিয়ে আয় তো ওপোরে। কোথায় গেলি তুই, খুকী?'

ভাঁড়ার ঘরে অভাবনীয় ভাবনায় বিব্রতা কাদম্বিনী হাতের সবখানি আচার মুখে গুঁজিয়া মুখের ভাবনার কুঞ্চনগুলি ঘুচাইয়া বাহিরে আসিল। কলতলায় হাত ধুইয়া সে দোতালায় গেল সৌম্যের সঙ্গে। ভূপেনের ছোট ঘরে ভূপেনের বিছানা পাতিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়েছিলে কেন বলত?'

সৌম্য বলিল, 'মুখে কি ভরেছিস ফেলে দে খুকী।'

কাদম্বিনী বাহিরে গিয়া মুখ খালি করিয়া আসিল। সৌম্য শুইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া বলিল, 'একটু সবুর সইল না, বিছানাটা ঝেড়ে দিতাম?'

সৌম্য বিছানার প্রান্তটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'বোস্ খুকী, এইখানে বোস।'

কাদম্বিনী বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'বসবার কি সময় আছে নাকি আমার? সবাই ওদিকে খেতে বসেছে, কাজ নেই? একশোবার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, জবাব দিচ্ছ না কেন? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমাকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলে কেন? মেজদার কি গলা বাবা! তোমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দিতে বলবে, তাও পাড়া শুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বলা চাই! আমি যেন কালা।'

কাদম্বিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল। সৌম্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'তোকে

তাঁডার ঘবে কেন যেতে বলেছিলাম বুঝতে পাবিস নি খুকী? সত্যি কথা বলিস। যদি বুঝতে পেবে থাকিস, এখুনি বাড়ী চলে যাব।'

কাদম্বিনী দু'চোখ বড বড় করিয়া বলিল, 'কি বুঝতে পাবিনি? কি বলছ তুমি? তোমাব আজ হযেছে কি বল তো?'

'মাথা ধবেছে।'

মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলিযা কাদম্বিনীব ডান হাতখানা নিজেব কপালে বাখিযা সৌম্য চোখ বুজিল। কাদম্বিনীব হাতেব তালুতে এখনো আচাবেব গন্ধ লাগিযা আছে। হাতে ছাডা ছাডা মৃদু কম্পনেব আবির্ভাব ঘটামাত্র সৌম্য তা টেব পাইল। এবাব হাতে টান পডিবে অনুমান কবিযা আবও জোবে সে হাতের তালু চাপিযা ধবিল কপালে। কিন্তু দেখা গেল, টানাটানি কাদম্বিনী পছন্দ কবে না।

'মাথা টিপে দেব?'

'না।'

'আমি তবে নীচে যাই, মা ডাকছে।'

সৌম্য তা জানে, চিবকাল মা'ই সকলকে ডাকিযা থাকে। কাদম্বিনী উঠিযা দাঁডানোয তাব আচাবেব গন্ধ মাখা হাতটি সৌমেব ছাডিযা দিতে হইল। চোখ মেলিযা সে দেখিতে পাইল কাঁচা আমে প্রথম বং ধবাব মত মৃদু একটু বঙেব আভাস কাদম্বিনীব মুখে দেখা দিযাছে এবং জগতেব সেবা অভিনেত্রীব মত সে নিজেই যেন পবিণত হইযা গিযাছে নির্ব্বাক বিস্ময ও প্রশ্নে। তবে অভিনয নয বলিযা এবকম সে হইযাছে এমনভাবে, যে দেখিলে মাযা হয।

সৌম্য মৃদুস্ববে বলিল, 'মা কেন ডাকছেন শুনে আমাকে একটু আচাব এনে দিবি খুকী?'

কাদম্বিনী বলিল, 'জ্বব আসছে, আচাব খেতে হবে না। সারা বাত

ঘুম হয় নি, ঘুমোও না একটু ?' বলিয়া সে চলিয়া গেল নীচে। খানিক পরে একটা চায়ের কাপে খানিকটা আচার ও ছোট একটি চামচ আনিয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল।

'আচার খাবে শুনে মা যা বকছে সমুদা ! মেজদা বললে, একটু কুইনিন মিশিয়ে দিতে, একটুখানি দিয়েছি। চার গ্রেণের বেশী নয়, সত্যি বলছি। টেরও পাবে না।'

সৌম্য উঠিয়া বসিল। দু' আঙ্গুলে একটু আচার তুলিয়া মাখাইয়া দিল কাদম্বিনীর ঠোঁটে। তারপর কাপে অত আচার থাকিতে চাখিতে গেল তার ঠোঁটের হাসি-মাখানো আচারটুকু। হাসি অবশ্য কাদম্বিনীর মিলাইয়া গেল তৎক্ষণাৎ এবং একটি ভয়ার্ত্ত কপোতীর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য রহিল না। কিন্তু কি করিবে সে ? সে তো ছেলেমানুষ আর সৌম্য তার কাছে চিরদিন দেবতার সমান। তা ছাড়া, তার জন্য বর খোঁজা হইতেছে, সৌম্য যদি তাকে বিবাহ করা ঠিক করিয়া থাকে সে তো ভালই। সুখের কথা। সৌম্যের সঙ্গে একা একা সিনেমায় যাইতে তখন আর কোন বাধাই থাকিবে না। দিনরাত যত খুসী গল্প করিতে পারিবে সৌম্যের সঙ্গে। কাদম্বিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সৌম্য বলিল, 'কাঁদছিস কেন ?'

কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'কাঁদছি না তো।'

সৌম্য খুসী হইয়া ভাবিল যে এ যদি আর কেউ হইত, তবে নিশ্চয় এরকম সরল জবাব দিত না, বলিত, চোখে আচার লাগিয়াছে। সত্য সত্যই চোখে আচার অথবা খোঁচা না লাগিলে সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার চোখে জলই যে আসিত না, একথাটা সৌম্যের আর মনে পড়িল না।

তারপর যে দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, সৌম্যের কাছে না হোক

কাদম্বিনীর কাছে সেগুলি হইয়া রহিল অতুলনীয়। বিরহের দিনগুলি পর্য্যন্ত। অন্ততঃ দেখা হইলেই সৌম্যের কাছে কাদম্বিনী দু'একবার তাই ঘোষণা করে এবং সৌম্য অবিশ্বাস করে না। এতকালের জানা শোনা মেয়েটার সম্বন্ধে সে একটা নূতন কথা জানিয়াছে। তার অভিজ্ঞতায় সরলতার হিসাবে কাদম্বিনীই আদর্শ বালিকা। কারণ, সরলতার সঙ্গে চিরদিন যে বোকামি সে মিশিয়া থাকিতে দেখিয়াছে কাদম্বিনীর মধ্যে সে তা খুঁজিয়া পায় না। ধারালো বুদ্ধি তার নাই, চালাক মেয়ে সে নয়। সৌম্য তা জানে। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া আর কোন বোকামির পরিচয়ই সে দেয় না। তার যে কথা ও কাজে সৌম্যের হাসি পায় সেগুলি সে বলে ও করে না-বলা ও না-করার প্রয়োজন সে জানে না বলিয়া, মস্তিষ্কের ওজন তার কম বলিয়া নয়। যা কিছু তাকে একবার বুঝাইয়া বলা যায় চোখের পলকে সে তা বুঝিতে পারে। এমন কি, পুরুষ ও নারীর প্রেম সংক্রান্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত সে এত সহজে আয়ত্ত করিযা ফেলে এবং ও-বিষযে এমন চমকপ্রদ মন্তব্য করে যে সময সময সৌম্যের মনে হয় সে বুঝি খনাকে বরাহের গণনা শিখাইতে যাওয়ার মত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে।

'মনে মনে হাসছিস, না খুকী ?'

'হাসছি ? কি বলছ তুমি পাগলের মত ? তুমি যখন এসব কথা বুঝিয়ে বলো, আমার তখন—তখন—, যাও বলব না তোমাকে।'

সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে। কাদম্বিনীর এই কথাগুলির মধ্যেই সে তার বোকামির অভাব ও সরলতার প্রমাণ খুঁজিয়া পায়। মনে মনে হাসছিস, না খুকী ? এই আকস্মিক প্রশ্নের মানে বুঝিতে বোকা মেয়ের সময় লাগিত, কেন মনে মনে হাসিবে কয়েকবার একথা জিজ্ঞাসা করিত এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো সৌম্যকেই বুঝাইয়া বলিতে হইত যে কবিত্বপূর্ণ

দার্শনিক তত্বকথা শুনিতে শুনিতে এক ধরণের নীরস অমার্জ্জিত হৃদয়হীন মানুষ মনে মনে হাসিয়া থাকে, পার্থিব লাভলোকসানের হিসাব ছাড়া জীবনে যারা আর কোন হিসাব জানে না। প্রশ্ন শোনামাত্র মানে বুঝিয়া কাদম্বিনী রাগিয়া তাকে বলিয়াছে পাগল, কিন্তু তার মুখে ভালবাসার কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে হাসার বদলে তার মানসিক অবস্থাটা কি রকম হয় বুঝাইয়া বলার মত শব্দ খুঁজিয়া না পাইয়া, হয়তো যে দু'একটি শব্দ মনে আসিয়াছিল লজ্জায় সেগুলি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, মেয়েদের চিরন্তন অধিকার খাটাইয়া এ অক্ষমতা গোপন করিয়াছে। যাও বলব না তোমাকে! কি মিষ্টি অভিমান, কি মধুর ছলনা! সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটা হইলে পূরা তিনমিনিট বক্তৃতা দিত, যার মানে বুঝিতে মন নয়, অভিধান খুঁজিতে হইত সৌম্যকে। ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতে চায় না। দু'একমাস নয়, কাদম্বিনীকে তার অনেকদিন ভাল লাগিবে, হয়তো একেবারে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত। গায়ে হলুদের আগের দিন কাদম্বিনীর কাছে সে গ্রহণ করিবে শেষ বিদায়। পরদিন ট্রেণের কামরায় বসিয়া সে যখন বাংলার বাহিরে মাঠ বন গাছপালার বিস্ময়কর বিপরীত গতি দেখিতে থাকিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে কাদম্বিনী তখন গায়ে মাখিবে হলুদ। নিজে মাখিবে না, সকলে মাখাইয়া দিবে।

"আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুই খুব কাঁদবি, না খুকী?"

"আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, না খোকা?"

এ ধরণের তামাসা সৌম্যের বিশেষ ভাল লাগে না। এই যা একটু দোষ আছে কাদম্বিনীর, স্নায়ুগুলি তার বড় সতেজ, মরার কথাতেও সে কাবু হয় না, মুখে হাত চাপা দিয়া সভয়ে বলে না, ওকথা বলতে নেই। একটা দুর্ব্বোধ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ জাগে সৌম্যের মধ্যে, কাদম্বিনী যেন বড়

বেশী হাসি খুসী, বড় বেশী আনন্দময়ী। তার ছেলেমানুষী ও সরলতার তুলনায় ভাবপ্রবণতা যেন বড় কম। হাসি তামাসা, কথা কাটাকাটি, ভিত্তিহীন আনন্দের পিরামিড বানানো এসব সে এত ভালবাসে বলিবার নয়। কে জানে সময় আসিলে ও কি ভাবে ভাঙিয়া পড়িবে, সামান্ত কারণে যে এত আনন্দ পায়, অত বড় আঘাতে কি প্রচণ্ড হইবে তার বেদনা? কালীঘাটের গলাকাটা ছাগশিশুর মতই বোধ হয় ছটফট করিবে। চোখেব সামনে বড় হওয়ার দাবীতে তার স্নেহ আর মমতা যার প্রাপ্য, তার মত প্রেমপিপাসু পাষণ্ডের হাত হইতে যাকে রক্ষা করা তার কর্ত্তব্য, তাব জীবনে এরকম ভয়ঙ্কব দুঃখের সম্ভাবনা বোধ হয় না আনাই তার উচিত ছিল। একটু অনুতাপ বোধ করে সৌম্য, কাছাকাছি কাদম্বিনীর বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চাহিযা সব মেয়ের মত ওকেও সে নিবিড় জোরালো মমতার সঙ্গে ভালবাসে। এইরকম স্বভাব সৌম্যের, এইরকম বাধ্য তার কোমল হৃদয়ের কোমলতর প্রেম। মনে আবেগ আসিবামাত্র হৃদয়ে প্রেমের বন্যা দেখা দেয়। আবেগটা বাদ দিযা, প্রেমের বন্যায় ভাঁটা ফেলিযা, ভালবাসাটা চিরস্থাযী কবিবাব সময় আসিলেই কাদম্বিনীকে আর যে তার ভাল লাগিবে না, এমন কি, কাঁচা আমের কচি শাঁসটুকুর মত তিতোই হয়ত লাগিবে, সেকথা সৌম্যের আর মনে থাকে না। আদরে আদরে কাদম্বিনীর সে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দেয।

তবু কাদম্বিনী মরে না, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া সত্বেও আনন্দে গদগদ হইযা বাঁচিযা থাকে, তার নিশ্চিত বিশ্বাসে সৌম্য পর্য্যন্ত অবাক হইযা যায। যত কাঁচা হোক, যত সরল হোক, যত বিশ্বাসী হোক, যত প্রবল প্রেম জাগিয়া থাক তার বুকে, আত্মরক্ষার কয়েকটা মূলমন্ত্র বারো বছরের মেয়েও যে জানে। লোকনিন্দা আছে, আত্মীয় স্বজনের ভয় আছে, আগামী কালের হিসাব আছে, গোপনে গোপনে ভাঙা ভাঙা ছেলেখেলাকে

প্রকাশ্য ও একটানা লীলাখেলায় পরিণত করার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, আরও আছে কত কিছু,—কাদম্বিনী যেন এ সমস্তের ধার ধারে না। সৌম্য যা বলিবে যা করিবে, তাই সই। ফলাফলের দায়িত্বটা যে অন্ততঃ সৌম্যের থাকা উচিত, এ দাবীও যেন সে করিবে না। তিনতলার ছাদ হইতে নিজের ইচ্ছায় উঠানে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত তার আত্মসমর্পণে হিসাব নাই, বিবেচনা নাই, না মরিবার ইচ্ছা নাই,—মরণের আতঙ্ক পর্য্যন্ত যেন নাই। তার ঝাঁপ দিবার কথা, সে ঝাঁপ দিয়াছে। সৌম্যকে সে ভালবাসে, ব্যস, সেইখানে সব হিসাব নিকাশের ইতি, তারপর আর কিছু নাই।

আঠারো বছর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর এ জিনিসটা কোন মেয়ের মধ্যে থাকা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অসম্ভব। এদের যে নরকে নেওয়া চলে না তা নয়। কিন্তু প্রথমে যাত্রা করিতে হয় স্বর্গের দিকে, সত্যের আবরণে অনেক মিথ্যাকে সামনে ধরিতে হয়, অনেক ভুলাইয়া ভুল করাকে করিয়া তুলিতে হয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের মত গ্রহণীয়, বাস্তবতার তুলি দিয়া সমস্ত ভবিষ্যতকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া করিতে হয় তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরবর্ত্তী জীবনের মত লোভনীয়,—আর প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া দিতে হয় আশ্বাস, জাগাইতে হয় বিশ্বাস। আটাশ বৎসর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর সৌম্য এ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, এর মধ্যে ফাঁকি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কাদম্বিনী যেন তার হাতে একখানা শিশুপাঠ্য রূপকথার বই তুলিয়া দিয়াছে, খবরের কাগজ পড়া বিদ্যায় যা বোঝা যায় না, দিনের পর দিন কাদম্বিনী যেন তাকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়াছে যে, যে মন দিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে তার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান সে মনটাও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তার চেয়ে যিনি ঢের বেশী চালাক এবং বর্ত্তমানের দেড়শো কোটিখানেক মন ছাড়াও অতীতের অগুন্তি মন তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের অগুন্তি

মনগুলিও তিনিই সৃষ্টি করিবেন; মন দিয়া মন জানার কাজটা অত সহজ নয়।

সৌম্য বলে, 'আমি কিরকম খারাপ লোক, জানিস খুকী?'

কাদম্বিনী বলে, 'জানি।'

'কি করে জানলি?'

'ওসব আমরা জানতে পারি। কচি খুকী তো আর নই আমি।'

কাদম্বিনী হাসে। তার সহজ আত্মবিশ্বাস ও গর্ব্ব দেখিয়া সত্য সত্যই মনে হয় কচি খুকী বোধ হয় সে নয়। জয় যেন সেই করিয়াছে সৌম্যকে এবং সৌম্য যে তার কাছে ধরা দিবে এবিষয়ে কোনদিন তার এতটকু সন্দেহও ছিল না। আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে সৌম্য একটু হাসে। এই রকম মনে করে মেয়েরা, মনে করে কিছু না করিয়াও তারাই করিয়াছে সব, সৌম্যদের বুকে ভালবাসা জাগাইয়াছে তারা, সৌম্যদের আপন করিয়াছে তারা, সৌম্যদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে তারা। এই ভালবাসার ব্যাপার যদি হয় কবিতা, তবে তারা এ কবিতার প্রেরণা। সৌম্যরা তো শুধু কাগজে কলমে কবিতাটা লেখার কাজটুকু করে। সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে। কাদম্বিনীর অবিশ্বাস্য নিশ্চিন্ত ভাব ও অন্ধ আত্মসমর্পণের একটা কারণ যেন সে আবিষ্কার করিতে পারে। তাকে জয় করিয়া নিজেকে কাদম্বিনী এত দামী মনে করিয়াছে, এমন আকাশস্পর্শী আত্মবিশ্বাস তার আসিয়াছে যে ভবিষ্যতের কথাটা মনে আনাও সে আর দরকারী মনে করে না। দু'চার দিন পরে যা ঘটিবেই সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিয়া কি হইবে? তবে একটা খটকা লাগিয়া থাকে সৌম্যের মনে। এই জল্পনা কল্পনা, দুজনের একত্র গ্রথিত জীবন সম্বন্ধে তার সঙ্গে গভীর বিস্তারিত আলোচনা কাদম্বিনীকে সীমাহীন আনন্দ দেওয়ার

কথা। এ আনন্দ সে কামনা করে না কেন? কিসে তার এই অস্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়াছে?

কাদম্বিনী কাছে থাকিলে নয়, নিজের ঘরে একা থাকিবার সময় ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের বড় রাগ হয়। একটা তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে, তার সম্বন্ধে এত ভাবনারই বা কি দরকার? ও তো আর তার নিজের জীবনের সমস্যা নয়!

একদিন কাদম্বিনীর বড়দাদার বৌ সৌম্যকে বলিল, 'আমার যেন কি হয়েছে ভাই সমু ঠাকুরপো, খালি অসুখে ভুগছি, আজ মাথা ধরছে, কাল জ্বরভাব হচ্ছে, একটা কিছু লেগেই আছে আমার। এমন ভয় পেয়ে গেছেন উনি!—ভেবে ভেবে শেষে ওঁর আবার কিছু না হয়। শীগগির আমাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবেন বলেছেন।'

সৌম্য বলিল, 'ভালই তো। কবে যাবেন?'

বড়বৌ বলিল, 'জেমসেদপুর থেকে খুকীকে দেখতে আসবে, নয় তো কবে নিয়ে যেতেন।'

'খুকীকে দেখতে আসবে নাকি?'

'ওমা, তুমি জাননা ভাই সমু ঠাকুরপো? কি আশ্চর্য্যি! ছেলে ওখানে কি যেন কাজ করে, আড়াইশো টাকা মাইনে পায়, বাপ হচ্ছে সাবজজ্, এখন পেন্সন নিয়েছে। পক্ষাঘাত না কি হয়েছে বাপটার, উঠতে পারেনা বিছানা থেকে, ছেলে তাই নিজে বন্ধুর সঙ্গে খুকীকে দেখতে আসবে।'

'চিঠি এসেছে কবে?'

'কাল।—ওমা তাইতো, তুমি তবে কি ক'রে জানবে? অসুখে ভুগে ভুগে আমার মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে ভাই সমু ঠাকুরপো।'

দিন তিনেক পরে ঘণ্টাতিনেকের জন্য কাদম্বিনীকে কাছে পাওয়া গেল বটে, কাদম্বিনী কিন্তু আপনা হইতে সবজজ-পুত্রের দেখিতে আসার কথাটা উল্লেখও করিল না! দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সৌম্যই শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জেমসেদপুর থেকে তোকে দেখতে আসবে, না?'

কাদম্বিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

'আসবে। বেশ মজা হবে, না?'

মজা হইবে! কাদম্বিনীর নির্ভয় নিশ্চিন্ত কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানা দেখিতে দেখিতে সৌম্যের মনে হইল সে যেন ম্যাজিক দেখিতেছে। কি হবে এবার?—বলিয়া যার কাঁদ কাঁদ হওয়া উচিত ছিল এ ব্যাপারটা তার কাছে শুধু মজা!

'যদি তোকে পছন্দ করে?'

'যদি কি? আমাকে পছন্দ করবে না, ইস্!'

সৌম্য বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তামাসা রাখ্ খুকি। তোকে দেখে যদি পছন্দ হয়, বিয়েব সব ঠিক হয়ে যায়, কি করবি তখন?'

কাদম্বিনী দু'হাতে খোঁপা ঠিক কবিতে করিতে বলিল, 'আমি আবার কি করব?'

সৌম্য তার গাম্ভীর্য্যকে আরও গম্ভীর করিয়া বলিল, 'কিন্তু তুই তো জানিস খুকী বিয়ে টিয়ে আমি করতে পারব না? তোকে যেদিন বিয়ে করব সেই দিন তোর জন্যে আমার সমস্ত ভালবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে। তুই তো জানিস আমি তা সইতে পারব না।'

কাদম্বিনী সহজভাবেই বলিল, 'দু'বার জানিস বললে। কি করে জানব আমি? কোন দিন বলেছ?'

'বলিনি?'—সৌম্য যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

'কবে বললে ? বিয়ে করলেই ভালবাসা বেম্মা হয়ে যাবে কেন বল তো শুনি।'

সৌম্য বলিল। পাঁচ মিনিটে তার নিজের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য জটিল যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ দিয়া এমন ভাবে কথাটা প্রমাণ করিয়া দিল যে কাদম্বিনীর আর বলিবার কিছুই রহিল না। সে তাই শুধু একটু হাসিল, বলিল, 'নাও, তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না। সবাইর আসবার সময় হ'ল, এবার আমি পালাই।'

সৌম্য ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'চালাকি করিনি খুকী। সত্যি তোকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'আচ্ছা সে হবে'খন।'

বলিয়া কাদম্বিনী চলিয়া যায়, সৌম্য তাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল।

'আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

কাদম্বিনী বলিল, 'হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে মানুষের লাগে।—তোমার মতলব আমি বুঝেছি মশায়,—একটু ঝগড়া করতে চাও তো ? আরেকদিন হবে, আজ সময় নেই।'

সৌম্য বলিল, 'তুই বড় ছেলেমানুষ খুকী, বড় বোকা তুই। কিন্তু তোকে আমি বলে রাখছি পরে যে আমায় দোষ দিবি তা হবে না, বিয়ে আমি কাউকে করব না।'

কাদম্বিনী সরলভাবে বলিল, 'একথা প্রথমে বলনি কেন ?'

সৌম্য বলিল, 'বিয়ে করব তাও তো বলিনি। প্রথমে বলিনি বলেই তুই আমাকে জোর করে বিয়ে করাবি নাকি তোকে ?'

রাগে সৌম্যের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। এখনও ভাবনা নাই কাদম্বিনীর, এখনও তার মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া যাইতেছে না ! অন্য মেয়ে

হইলে আতঙ্কে এতক্ষণ যে আধমরা হইয়া যাইত। কিন্তু তার শেষ কথাটা কাদম্বিনী যেভাবে গ্রহণ করিল, রাগের বদলে সৌম্য তাতে একেবারে বনিয়া গেল থ। কাদম্বিনীও যে রাগিতে জানে আজ সে তা টের পাইল প্রথম।

মুখ লাল করিয়া কাদম্বিনী বলিল, 'গ্যাখো, শোন বলি তোমাকে, মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যা শুনলে মানুষের গা জ্বলে' যায়। তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে পায়ে ধরে' সেধেছি তোমার? ও, ভারি তো মানুষ তুমি! তুমি বিয়ে না করলে আমার যেন বর জুটবে না!'

কাদম্বিনী তো চলিয়া গেল গট গট করিয়া, বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া সৌম্য অনেকক্ষণ বনিয়া রহিল থ। কাদম্বিনীর রাগটা আশ্চর্য্য নয় কিন্তু এমন রাগ!—আজ পর্য্যন্ত যে একদিনও রাগ করে নাই? তা ছাড়া, কান্নাবিহীন, অভিমানবিহীন এ কোন্ দেশী রাগ ছেলেমানুষ মেয়েটার? কথাগুলি শেষ করিয়াও তো অন্ততঃ একটু তার কাঁদা উচিত ছিল। এ যেন সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার রাগ। শুধু রাগ,—নিছক অবিমিশ্র রাগ। এককোঁটা অনুরাগও যেন কারো জন্য তার নাই।

সাতদিন পরে জেমসেদপুরের পাত্রটি সবন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিল। পাত্রের মেয়ে পছন্দ হইলে তার মামা আসিয়া আর একবার দেখিয়া যাইবে। তারপর হইবে পাকা কথা। এই সাত দিনের মধ্যে সৌম্য শুধু একদিন কিছুক্ষণের জন্য অসমঞ্জবাবুর বাড়ী গিয়াছিল। এক ফাঁকে কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'সেদিন হঠাৎ অত রেগে গেলি কেন রে খুকী?'

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'রাগ হয়েছিল তাই।'

'পরশু তোকে দেখতে আসবে, না?'

'হ্যাঁ। খুব হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার? বাবাকে বলনা গিয়ে, এখ্খুনি বাবা ওদের টেলিগ্রাম ক'রে আসতে বারণ ক'রে দেবে।'

সৌম্য ম্লানমুখে বলিয়াছিল, 'সত্যি হিংসে হচ্ছে। কিন্তু জানিস তো, বিয়ে আমি কোনদিন করব না।'

কাদম্বিনী বলিল, 'তা না করলে, আমাকে দোষ দিওনা কিন্তু শেষে! ওদের দেখতে আসা বন্ধ করার উপায় ব'লে দিলাম।'

পাকা মেয়ের মত কথা। সৌম্য সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখ আর চোখ পরীক্ষা করিয়া দেখিযাছিল। কিন্তু কাদম্বিনীর মত সরল কাঁচা ঘরোয়া মেয়ের মুখে চোখে সে কি পাকামি খুঁজিয়া পাইবে?

তারপর সৌম্য বড়বৌকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

'ক'দিন থেকে খুকীর কি হয়েছে বলুন তো বৌদি? সব সময় মুখ ম্লান ক'বে থাকে কেন?'

বড় বৌ বলিয়াছিল, 'কই আমি তো ওকে মুখ ম্লান ক'রে থাকতে দেখিনি ভাই সমু ঠাকুরপো? দেখবো কি, নিজের অসুখ নিয়েই সব সময় যা বিব্রত হ'যে থাকি। বেশ হাসিখুসীই তো দেখি ভাই সমু ঠাকুরপো?'

তিনটি বন্ধুর সঙ্গে ছেলে মেযে দেখিতে আসিল বিকালের দিকে। গাযে একটা হাল্কা সিল্কের পাঞ্জাবী চাপাইয়া প্রসাধনের সময মুখে ক্রীম মাখার মত একটা হাল্কা অবহেলার মত ভাব মুখে ফুটাইযা রাখিয়া সৌম্য তার আগেই এ বাড়ীতে হাজির হইযাছিল। একবার অন্দবে পাক দিয়া আসিযা সে দক্ষিণের বড় ঘরখানায আগন্তুকদের মধ্যে গিযা বসিল। ছেলে আব তার বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলিয়া আলাপও করিল। ছেলের নাম দিব্যেন্দু, দেখিতে ভালই। তবে একটু রোগা আর লাজুক। পড়িতে পড়িতে মেরুদণ্ডটা একটু বাঁকাইয়া যে সব ছেলে পরীক্ষায ফার্ষ্ট হয় তাদের মত!

কাদম্বিনী আসিয়া খোলা জানালার সামনে বসিল, আলোতে তাকে

যাতে ভাল করিয়া দেখা যায়। তিন জোড়া অপরিচিত চোখ তাকে খুব ভাল করিয়াই দেখিল, কেবল যার দেখাটা ছিল সব চেয়ে দরকারী সে এক সেকেণ্ডের জন্য দেখিয়াই পূরা একমিনিটকাল নামাইয়া রাখিতে লাগিল চোখ। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল কাদম্বিনীকে, ইংরাজী বাংলা লেখানো হইল তাকে দিয়া, তার সূচী কর্ম্ম দেখানো হইল, হারমোনিয়াম বাজাইয়া সিকিখানা গান আর এস্রাজে খানিকটা গজল সুর সে সকলকে শুনাইয়া দিল। লজ্জা ভয় ও নম্রতার যে মধুর মুখোস পরিয়া কাদম্বিনী ধীরপদে ঘরে ঢুকিয়াছিল এত কাণ্ডের পরে আবার তেমনি ধীরপদে অন্দরে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই দেখিয়া সৌম্যের মনে হইতে লাগিল, পাণের বদলে সে বুঝি শুধু খয়ের চিবাইতেছে। আগাগোড়া কাদম্বিনীকে সে অবাক হইয়া লক্ষ্য করিয়াছে। চারমাস ধরিয়া সে যাকে ভালবাসিয়াছে তার সামনে কাদম্বিনীর মত মেয়ে যে চারজন অপরিচিত যুবকের কাছে এমন নিখুঁত ভাবে নিজেকে দেখাইতে পারে এ অভিজ্ঞতা সৌম্যের ছিল না। এ কি অভিনয়? হে ভগবান, একি অভিনয় তাব কাদম্বিনীর? কিম্বা তার চারমাসের প্রেমটাই তার কাছে কিছুই নয়, প্রতিদিনকাব ডালভাত খাওয়া, সাজগোজ করার মত তুচ্ছ? তাই সে চারমাস তার সঙ্গে ভালবাসার খেলা না খেলিলেও যেমনভাবে নিজেকে দেখাইতে পারিত, আজও অবিকল তেমনিভাবে দেখাইয়া যাইতে পারিল? এমন একটা রেখা সে কাদম্বিনীর মুখে দেখিতে পাইল না, এমন একটি ভঙ্গি তার চোখে পড়িল না যার মধ্যে গত চারমাসের একটি মিনিটকে সে খুঁজিয়া পায়!

কিছু বুঝিতে পারে না সৌম্য। বাড়ী ফিরিয়া সে ছটফট করিতে থাকে। ওমিলনাইন-কেশতৈলের অতি ক্ষীণ একটি গন্ধ যেন সে অনুভব করিতে পারে। মাথা ঘুরিতে থাকে সৌম্যের, গা বমি বমি করে।

একি সম্ভব? কাদম্বিনীর প্রকৃতির সঙ্গে একি খাপ খায়? সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটাও তো ছ'মাস পরে হঠাৎ তাকে দেখিয়া একটু পাংশু হইয়া গিয়াছিল!

পরদিন সকালে সৌম্য কাদম্বিনীকে বলিয়া আসিল, 'আজ দুপুরে সেখানে একবার যেতে পারবি খুকী?'

'খুব পারব? ক'টার সময়?'

'একটার সময় যাস।'

প্রতিবেশীর বাড়ী যাওয়ার নাম করিয়া কাদম্বিনী বেলা একটার সময় আসিয়া দাঁড়াইল তাদের বাড়ীর সামনের পথটার মোড়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডটার কাছে। সৌম্য অপেক্ষা করিতেছিল। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া দুজনে তাদের হোটেলের ঘরখানায় হাজির হইল অল্পক্ষণের মধ্যেই। সমস্ত পথ সৌম্য একটি কথাও বলে নাই। কিছুক্ষণ বক বক করিয়া কাদম্বিনীও শেষে চুপ করিয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিযাই সৌম্য সটান বিছানায় শুইযা পড়িল। তার শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে কাদম্বিনীব প্রশ্নের জবাবে বলিল, 'তুই আমাকে ভালবাসিস্ না খুকী।'

কাদম্বিনী বলিল, 'তা তো তুমি বলবেই। আগেব বার বাড়ীতে বলে এসেছিলাম ঊষাদেব বাড়ী যাচ্ছি, একটু পরেই মা ঝিকে পাঠিয়ে দিযেছিল আমায ডাকতে। সারা দুপুব বাইবে কাটিযে বাড়ীতে কৈফিযত দেওয়ার মজা মেযে হ'লে বুঝতে।'

'তুই বুঝি ভাবিস বাড়ীর লোকেব রাগ, লোকলজ্জা এসব গ্রাহ্য না করলেই ভালবাসা প্রমাণ হয়ে যায?'

'আমি ভালবাসার কিছু জানি না, হল?'

সৌম্য হতাশভাবে বলিল, 'আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে বলে তোর একটুও কষ্ট হচ্ছে না।'

কাদম্বিনী সহজভাবে বলিল, 'আমি বলেছি ছাড়াছাড়ি হ'তে?'

'কিন্তু তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে—'

'আমি বলেছি বিয়ে হোক?'

তারপর দুজনেই চুপ করিয়া গেল। অল্পক্ষণের জন্য। হঠাৎ কাদম্বিনী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'তুমি কিছু বোঝো না। আমি কি করব, আমার কি করার আছে? তোমার কথা শুনতে হয়, তুমি যা বল করি, বাড়ীর লোকের কথা শুনতে হয়, তারা যা বলে করি।'

কান্না! চাপিয়া রাখা কান্না এতদিনে বাহির হইয়া আসিতেছে। কাদম্বিনীর আকস্মিক উত্তেজনায় সৌম্য উঠিয়া বসিল, কাদম্বিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কিন্তু লোকের কথা শুনে তো তোর সুখদুখ জাগে না খুকী? তোর মনে কষ্ট হ'লে তো বাড়ীর লোকের হুকুমে সেটা উপে যায় না?'

কাঁদ কাঁদ ভাবটা কাদম্বিনীর উপিয়া গেল। চোখ মিট মিট করিতে করিতে সে বলিল, 'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কষ্ট হ'লে বাড়ীর লোকে কি করবে?' তারপর হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হওযার মত হঠাৎ হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, তোমার কি হয়েছে জানো? মাথা ধবে' ধরে' মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে।'

এবার সৌম্য অনেকক্ষণ চুপচাপ চিৎ হইযা শুইযা রহিল। কপালে কাদম্বিনীর হাতের স্পর্শে অনুভব করার পর ক্লান্তস্বরে বলিল, 'তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা খুকী।'

'কেন?'

'তোর বিয়ের সব ঠিকঠাক হচ্ছে, আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত হবে না। আজকেই আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাক। কেমন?'

সৌম্য এতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল। কথাটা বলিয়া কাদম্বিনীর মুখের ভাব দেখিবার জন্য সে চোখ মেলিল। অল্পক্ষণের জন্য তার মনে হইল

কাদম্বিনীর মুখের চামড়াটা যেন টান হইয়া চক চক করিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া কাদম্বিনী যখন কথা বলিল তখন সে বুঝিতে পারিল এটা তার কল্পনা অথবা আলোর কারসাজি।

'আমি কি বলব বলো? আমি তো বলেছি তুমি যা বলবে তাই হবে। কিন্তু শেষ দিনটা তা হলে মুখ ভার করে থেকো না, হেসে কথা বলো একটু।'

সৌম্য উঠিয়া বসিল। জুতায় পা ঢুকাইয়া ফিতা লাগাইতে লাগাইতে বলিল, 'চল্ বাড়ী যাই।'

উদ্ভ্রান্ত চিত্তের এলোমেলো চিন্তার মধ্য হইতে সৌম্য ক্রমে ক্রমে একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বকথা আবিষ্কার করে। এ জগতে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, সমস্ত এখানে আবোল-তাবোল। সেই জন্যই একটু যাদের বুদ্ধি আছে তারা বলিয়া থাকে, ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণ করে। আসলে একথাটাও একপেশে সত্য। নিয়মটা নিয়ম না ব্যতিক্রমটা নিয়ম, কে তা বলিতে পারে? দশবার নিয়ম আর একবার ব্যতিক্রমের দেখা পাইলে নিয়মটাকে মানুষ নিযম বলে কিন্তু দশবার ব্যতিক্রম আর একবার নিয়মের দেখা পাইলে মানুষ তো ব্যতিক্রমটাকেই নিযম বলিত? এই ভীষণ জটিল তত্ত্বটা আবিষ্কার করার পর সৌম্য কিছুক্ষণ গভীর তৃপ্তি বোধ করে: প্রহারের পর চকচকে খেলনা পাইলে ছোট ছেলে যেমন সজল চোখে আহ্লাদে গদ-গদ হয়, এই দুশ্চিন্তাটি আয়ত্ত করার পর সৌম্যের আহত মনে তেমনি সঞ্চার হয় আনন্দের। সেই একুশ বছরের মেয়েটা যদি চুলোয় গিযা থাকে, কাদম্বিনীও চুলোয় যাক্। কোর্টে গিয়া একটা পেটি কেসে মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া সে এমন বক্তৃতা জুড়িযা দেয যে তিনবার সংক্ষেপে তার বক্তৃতা শেষ করিতে বলিয়া হাকিম তার মক্কেলের সাত টাকা জরিমানা করিয়া দেন।

এদিকে একদিন জেমসেদপুরবাসী দিব্যেন্দুর মামা আসিয়া কাদম্বিনীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া যান এবং দেখিতে দেখিতে কথাবার্তা পাকা হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়। তখন একদিন সৌম্য কাদম্বিনীকে দেখিতে যায়। অপরাহ্ণ বলিয়া বড়বৌ তাকে দেয় খাবার আর কাদম্বিনী করিয়া দেয় চা।

বড়বৌ জিজ্ঞাসা করে, 'এতদিন আসনি যে ভাই সমু ঠাকুরপো ?'

কাদম্বিনী মুচকি হাসিয়া তামাসা করিয়া বলে, 'মাথা ধরার জন্যে বোধ হয়।'

বড়বৌ বলে, 'একটু রোগাই যেন তোমাকে দেখাচ্ছে সত্যি। অসুখ বিসুখের কথা তো শুনিনি ? আমি তো এদিকে অসুখে ভুগে ভুগে মরতে বসেছি ভাই সমু ঠাকুরপো। উনি তো ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছেন। বলছেন খুকীর বিয়েটা হয়ে গেলেই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

কাদম্বিনী বলে, 'বোসো, পালিয়ে যেও না। একটা নতুন আচার করেছি, তোমাকে চাখতে হবে। ওপোরে বাবাকে খাবার দিয়ে এখখুনি আসছি।'

একহাতে খাবারের প্লেট অন্য হাতে জলের গ্লাস লইয়া লঘুপদে কাদম্বিনীকে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া সৌম্যের সাধ হয় তার খাবারের প্লেট, জলের গ্লাস, চায়ের কাপ আর দেবাল ভাঙিয়া খানকয়েক ইট মেয়েটাকে ছুঁড়িয়া মারে।

তবু সে বড়বৌকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বৌদি, খুকীর নাকি বর পছন্দ হয় নি, লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদে ?'

বড়বৌ বলে, 'কই না, কাঁদে না তো ? আমি কখনো দেখিনি ভাই সমু ঠাকুরপো ওকে কাঁদতে। দেখব কি, যা ভোগাটাই ভুগছি

অসুখে! কিন্তু বর খুকীর পছন্দ হয়েছে, ওবাড়ীর উষার কাছে নাকি বলেছে।'

কাদম্বিনী নীচে নামিয়া সৌম্যকে খানিকটা আচার আনিয়া দেয়, নিজেও পরম তৃপ্তির সঙ্গে এক খাবলা আচার চাখিতে আরম্ভ করে। সৌম্য হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'তোর বাবার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে খুকী। আগে বলে আসি, তারপর তোর আচার চাখব।'

বাসর ঘরে, মেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর ঘরে যখন সকলের হাসি তামাসা গানের সুরের রেশটুকুও বোধ হয় মিলাইয়া যাওয়ার সময় পায় নাই, সৌম্যের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাদম্বিনী তখন সুরু করে কান্না। শুকনো গ্রীষ্মের পর বর্ষার মত প্রবল, অশান্ত, অফুরন্ত কান্না।

কাঁদিতে কাঁদিতে কোন রকমে বলে, 'তুমি আমায় বিয়ে না করলে আমি বিষ খেয়ে মরে' যেতাম।'

কাঁদে সে ঘণ্টাখানেকের কম নয়। মুখে হাসি ফুটিতে লাগে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা।

'আমাকে তুমি এবার ঘেন্না করবে?'

'তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোকে ঘেন্না করতে পারব মনে হয় না খুকী।'

কাদম্বিনী বলে, 'এখনো আমাকে খুকী বলবে নাকি? আর খ্যাখো, তুই বোলো না আমাকে। বিচ্ছিরি শোনায়।'

স্ত্রী হওয়ার পর স্ত্রীত্বের দাবী আরম্ভ করা সৌম্যও তার অন্যায় মনে করে না।

অবগুণ্ঠিত

বাড়ী থেকে বার হয়েই সামনে পড়ে এক সার গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ীকে পথ দেবার জন্য নবীনকে পথপ্রান্তে শ্যাওলা-ধরা ভাঙা বাড়ীর দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াতে হয়। একটা মোটরকে পথ দেবার জন্য গরুর গাড়ীগুলিও যতদূর সম্ভব পথের ধারে সরে এসেছে।

বিরক্তি নবীনের জাগে না। অন্তঃপুরের শান্ত-মধুর মোহ মনকে তার আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, মন ভরা তার ক্ষমা ও বিনয়, আত্মত্যাগের উদারতা। বেরিয়ে আসবার আগে বৌ একবার ঘরে এসেছিল, যেমন রোজ আসে, জলের গ্লাস আর পান হাতে নিয়ে, জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে আর কেবল দিনের আলো ও জাগ্রত পরিবারের চেতনা তার মধ্যে যে রূপান্তর এনে দেয়, তাই দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত মিলনে নূতন একটা স্বাদ সঞ্চার করতে।

বৌ নিজে যেচে আসে না, মা পাঠিয়ে দেন। অন্ধকার রাত্রের দীর্ঘ মিলনের পর দিনের বেলা টাকা রোজগার করতে বেরিয়ে যাবার আগে এই কয়েক মিনিটের মিলনটুকু ছেলের যে ভূরি ভোজনের পর চাটনির মত মধুর লাগবে, মার কি আর তা অজানা আছে?

একটি পুরুষকে দিয়ে রোজগার করিয়ে তিনিও তো এতবড় সংসার ফেঁদেছেন!

বৌ ঘোমটায় প্রায় মুখ ঢেকেই ঘরে ঢোকে, চোখ হয়ত পেতে রাখে পদক্ষেপের দিকে, তবু যে কি ক'রে চারদিকে তার নজর থাকে! নবীনকে জল দেয়, পান দেয়, নিজেকে দেয়। মনে হয়, বুকটা যেন তার ধুক ধুক করছে।

'সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘরে আসতে এমন লজ্জা করে!'

'আসো কেন?'

'মা যে পান জল দিয়ে যেতে বলেন।'

'মা না বললে আসতে না?'

মাথা একটু নামিয়ে চোখের পাতার চকিত গতিতে স্বামীর চোখে চোখে তাকানোকে পলকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে বৌ মৃদু একটু হাসে, পায়ের নখ দিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করে মেঝে। নবীনের বুঝতে কষ্ট হয় না, বৌ সব সময়েই তার কাছে আসবার জন্য উন্মুখ, লজ্জা ভয় শুধু তার বাধা। হঠাৎ উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা বৌ বন্ধ করে দেয়। রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'মাগো, ও বাড়ীর ছাতে কে যেন দাঁড়িয়ে!'

'তাকিয়ে দেখছিল নাকি?'

সঙ্কোচের পেষণে বৌ যেন আকারেই ছোট হ'য়ে গেছে, নিজেই যেন সে নিজের মধ্যে মিশে যেতে চায়। ও বাড়ীর ছাতটিতে কোনদিন কেউ ওঠে না, ছাতে আলসেও নেই, ছাতে উঠবার সিঁড়িও নেই। জানালা একটু ফাঁক করে' নবীন দেখতে পায়, মিস্ত্রী ছাতের ফুটো মেরামত করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দাদার ঘরের সামনে দিয়ে নবীনকে আসতে হয়। দাদার বয়েস অনেক, ছেলেমেয়ে অনেক, তামাক টানার ক্ষমতা অসীম, কম কেবল উপার্জ্জন। তবু নবীনের বৌদিও জল পান দিতে এসময় একবার ঘরে আসেন। তবে জামার বোতাম লাগিয়ে দেন না।

নবীনের বৌ সর্ব্বদা সেমিজ পরে থাকে, কিন্তু বৌদির সে প্রয়োজন অনেকদিন মিটে গেছে। তবু নবীন ঘরের দরজায় দাঁড়ালে তিনি কাপড়ের এখান ও ওখানটা টেনে দেহের অনাবৃত অংশের খানিক খানিক আবৃত করে ফেলেন, আঁচল তুলে দেন মাথায়। তবে কোলের মেয়েটি যদি কোল

অধিকার ক'রে স্তন্যপান করে, বক্ষের আবরণ তাঁর দরকার হয় না। সাতটি সন্তানের জননী তিনি, দেহ তাঁর একস্তূপ পিণ্ডাকার মাংস, বসন টেনে দেহের খানিক খানিক আবৃত করা আর মাথায় আঁচল তোলার অভিব্যক্তি তাঁর যতটুকু মনোরম, স্তন্যদায়িনী জননীরূপে তিনি যে তার চেয়ে শতগুণ মাধুর্য্য বিকাশ করেন, সকলের মত এইটুকু জানতে কি আর তার বাকী আছে ?

সংসারের তুচ্ছ প্রয়োজনের কথা বলতে দাদার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বৌদির অভিনব লজ্জাহীন লজ্জার মৃদুতা আর বাৎসল্যের কোমলতা নবীন অভ্যস্ত দৃষ্টিতে শুষে নেয়,—দুই-ই তার মনে জোগায় শান্তি।

মন্থরগতিতে সে অন্তঃপুরের বাকী অংশ অতিক্রম করে। রান্নাঘরে ভাগ্নী আর ছোটবোন আপিসের ভাত জোগানর ব্যস্ততায় কোমরে আঁচল বেঁধেছিল, এখনকার আলস্যেও সে-বাঁধন আলগা হয় নি। রান্নাঘরেই উনুনের সামনে পিঁড়িতে বসে' বোন যেন কি বই পড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, উনানে চাপানো মোটা চাল সিদ্ধ হ'যে এলে মুখ তুলে' তাকাবে। মুখে তার গভীর বিষাদের ছাপ। বয়েস হয়েছে অনেক কিন্তু বিয়ে হয নি, কোন বিষয়ে মনোযোগ দিলেই মনের দুঃখটা তার মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কি কমনীয়ই মনে হয় এই বিষাদে তার মুখ,—মুখের কান্তি যেন হৃদয়ের গভীরতায় রসালো হয়েছে। একদিন সে ছিল অবাধ্য দুরন্ত বালিকা, প্রথম কৈশোরে যার নির্ল্লজ্জ বেহায়াপনা সকলকে চমক দিত, আজ সে যেন মাখনের মত কোমলা, লতার মত আশ্রয়ভিখারিনী, পানীযের মত স্নেহবিহ্বলা।

ব্যথা বোধ আর অভিমান ছাড়া আর কোন অনুভূতি কি বোনের তার আছে? কে জানে যার হাতে বোনকে সে স'পে' দেবে, ব্যথা বোধকে আনন্দের রূপ দেওয়া আর অভিমানকে আবেগোচ্ছ্বাসে পরিণত করার

ক্ষমতা তার থাকবে কি না? সকলে কি লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করার কৌশল আর কূটনীতি জানে?

ভাগ্নী একমনে বুনে যায় তার কার্পেটের আসন। মুখে অবশ্য সে বলে বোনের জন্যই কার্পেট বোনা, কিন্তু বিদেশ থেকে স্বামী ফিরে এলে এই আসনে তাকে বসতে দেবার কল্পনায় বার বার ঘর গোনা তার ভুল হয়ে যায়।

নবীনের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। বিদেশের সেই মানুষটি তার ভাগ্নীর সঞ্চিত ঔৎসুক্যের দাম দিতে পারবে! বিদেশে বসে' নিজের মধ্যে সেও এই মূল্যই সঞ্চিত করছে—ভাগ্নী তার ঠকবে না, প্রাপ্য তার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হয়ে যাবে।

তার ভাগ্নীকে সুখী ক'রে নিজে সুখী হবার লোভে, প্রিয়ার প্রীতির পুষ্পাঞ্জলিতে নিজেকে পূজা করার লোভে, বিদেশবাসী সেই মানুষটি নিজেকে কি ভাবেই না পরিবর্তিত করেছে! গম্ভীর, জ্ঞানী, শুষ্ক সেই মানুষটি আজ হাসতে জানে, অজ্ঞান হ'তে জানে, রসের স্বাদ জানে।

শেষ গরুর গাড়ীটি এগিয়ে গেলে নবীন পথের ডাইনে আসবার সুযোগ পায়। মোটর গাড়ীটি ধূলো উড়িয়ে উধাও হ'য়ে গেছে। ধীরে ধীরে নবীন এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে পা তার পড়ে টায়ারের দাগে। কিন্তু পথের ধূলোয় কোন গাড়ীর চাকাই এমন গভীর দাগ এঁকে যায় না, কেবল পদক্ষেপে যা অনুভব করা চলে।

পিছন থেকে খড়খড়ি-বন্ধ ছ্যাক্‌রা ঘোড়ার গাড়ীটি যখন নবীনের নাগাল পায়, মন্থরপদে চললেও নবীন তখন গরুর গাড়ীগুলিকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ঘোড়ার গাড়ীকে পথ দিতে তাকে পথের একেবারে ধারে স'রে যেতে হয় না। খড়খড়ির অন্তরালে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সে কেবল খায় এক হোঁচোট। বোরখা-পরা

রমণীটি নিজেই ত্রস্তে ধারে সরে' গিয়ে তার সংযম বাঁচায়। সংঘর্ষ বাঁচে, কিন্তু মনে মনে নবীন এমন লজ্জা বোধ করে, যেন বোরখা এবং বোরখার ভিতরের নারীর মর্য্যাদা সে পথের ধূলোতে লুটিয়ে দিয়েছে।

দূরে এক গির্জ্জার চূড়ায় ঘড়িতে সময় আঁকা আছে। সেদিকে তাকিয়ে নবীন গতিবেগ একটু বাড়িয়ে দেয়। কিছুদূর চলে' আপনা থেকে তার গতি আবার হ'য়ে আসে মন্থর। ধূলো উড়িয়ে আরেকটি মোটর পাশ দিয়ে চলে যায়, মোটরটি চালাচ্ছে এক বিদেশী নারী, তার পাশে এক বিদেশী পুরুষ, মুখে তার মোটা সিগার। পিছনের সিট্‌টা খালি পড়ে' আছে। একবার নবীনের মনে হয়, সে যদি ওই সিটে বসে' একটু তাড়াতাড়ি তার পথটুকু অতিক্রম করত, জগতে কার তাতে কি ক্ষতি ছিল? তারপর নবীনের হাসি আসে। খালি আছে বলেই কি যে সিটে খানসামা বসে, সেই সিটে সে বসতে পারে! সে ভদ্রলোক নয়?

একটু জোরে জোরে চলতে আরম্ভ ক'রে নবীন অজ্ঞাতসারে আবার নিজের গতিবেগ কমিয়ে আনে। পিছন থেকে এসে তাকে অতিক্রম ক'রে চলে' যায় বাঁক কাঁধে এক জেলে আর ঝুড়ি মাথায় এক জেলেনী। রুই-কাতলার বংশধর আর হাঁড়িভরা জলের ভারে বাঁক আর দেহ দুই বাঁকা হয়ে গেছে, তবু খালি ঝুড়ি মাথায় জেলেনীর চলনের সঙ্গে তার চলনের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য। নবীনের মনে হয়, জেলেনীর প্রকট যৌবন প্রত্যেক পদক্ষেপে যেভাবে লীলায়িত হয়ে উঠেছে, তারই ছন্দে জেলে নৃত্য করছে, জেলেনীর হাতের রূপোর চুড়ির ক্ষীণ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গত ক'রে চলেছে জেলের দুটি হাঁড়ির জলে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

পাশের এক চোরা-গলি থেকে বেরিয়ে আসেন মাঝবয়সী শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক, মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ, জামা-কাপড়ে সস্তা বিলাসিতা আর সস্তা এসেন্স।

নবীনকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, 'আপিস যাচ্ছ ? ঝি আসে নি, ঝিকে ডাকতে গিয়েছিলাম ভাই। নচ্ছার মাগী—'

হয়ত ঝি-ই ভদ্রলোকের প্রিয়া। দেহে মনে বসনে ভূষণে দাসীকে তৃপ্তি দিয়ে জীবনের চরম তৃপ্তি লাভের উপযোগী করেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

লোকটির অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক সঙ্গ পরিহার করবার কোন উপায় নবীন খুঁজে পায় না, বরং সঙ্গে সঙ্গে চলবার জন্ম তাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হয়, লোকটির আবোল-তাবোল বকুনির অর্দ্ধেক কানে না তুললেও মাঝে মাঝে সায় দিতে হয়। এর সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলতে দেখলে তার সম্বন্ধেও লোকে কিছু যদি ভেবে বসে ? ভয়ে ভয়ে নবীন চারদিকে তাকায়। সমস্ত রাত্রি এক গৃহত্যাগিনীর সঙ্গে যাপন করে, স্ত্রীপুত্রের অসুখ বিসুখ আর সাংসারিক অশান্তির যে গল্প লোকটি ফেঁদে বসেছেন দুই একটি টাকা ধার চাওয়াই তার একমাত্র পরিণতি সন্দেহ নেই। মনে ব্যথা না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করার একটা লাগসই কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে নবীন উৎকণ্ঠিত হযে ওঠে।

'একটা পয়সা হাতে নেই, থাকলে নিশ্চয় দিতাম।'—বিড়বিড় ক'রে সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নবীনও নিজের সাংসারিক দুঃখকষ্টের খাপছাড়া তালিকা দাখিল করে। মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

যেমন খারাপ হয়ে যায় বৌ-এর কোন আব্দার রক্ষা করতে না পারলে।

নিজেকে লোপ ক'রে বিশ্বের ভাল মন্দ সকল মানুষের মনে আঘাত লাগা নিবারণ করার দায়িত্ব যেন সে গ্রহণ করেছে।

লোকটি একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলে, 'তোমার না মাইনে বেড়েছে এমাস থেকে ?'

নবীন মাথা নেড়ে বলে, 'কই আর বাড়ল? বাড়াবে বাড়াবে ক'রে বাড়াচ্ছে না।'

মনটা নবীনের আরও খারাপ হ'য়ে যায়। সে জানে জোর ক'রে চেপে ধরলে কবে তার মাইনে বেড়ে যেত, কিন্তু জোর ক'রে চেপে ধরতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। একটু ভয়ও করে।

মাইনে বাড়লে বৌকে সেই শাড়ীখানা কিনে দিতে পারত। বৌ জোর ক'রে চেপে ধরলে অবশ্য এখনও দিতে পারে, কিন্তু বৌ তো আর সেভাবে কিছু চাইবে না। এই জন্যই তো বৌকে সে এত ভালবাসে।

সিঁড়ি

একতলার উত্তর প্রান্ত থেকে দোতলা আর তিনতলার মধ্যস্থতা অতিক্রম ক'রে সিঁড়িটা তেতলার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে পৌঁছানোর জন্যে সাধারণ নিয়মে চৌষট্টিবার একটি পায়ের জোরে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করতে হয। তবে সাধারণ নিয়ম সকলের জন্য নয়। এমন মানুষও জগতে আছে যারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় দুটো তিনটে ধাপ একেবারে ডিঙিয়ে যায়। এরা মানুষ হয়েও ঠিক মানুয নয়,—মহামানব। মহামানব এইজন্যে যে এ জগতে মহামানবী নেই, কারণ মেয়েরা কোনদিন দুটো তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে ওঠে না। ক্ষমতাও নেই, বাধাও আছে।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটাকে ঢাকা দেবার ছাদটুকুর উপরে পাতলা দেয়াল আব টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এবাড়ীতে। পথ থেকে বাড়ীব ভিটেয় ওঠবার জন্য আর একতলার বারান্দা থেকে উঠানে নামবার জন্য এ বাড়ীতে ধাপের ব্যবস্থা মোটে একটি করে, কিন্তু চিলেকুঠিতে ওঠা নামার জন্য ধাপ আছে দুটি, তাই এও একটা সিঁড়ি। দু'টি একের সমষ্টি যখন দুই এবং ধাপের সমষ্টি মাত্রেই সিঁড়ি, চিলেকুঠিটিকে সিঁড়ি থাকার গৌরব না দিয়ে উপায় নেই।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটিকে বাড়ীর ছায়াই শীতল করে রাখে, চিলেকুঠির সিঁড়ি কিন্তু চিলেকুঠির ছায়া পায় শেষ-বেলায়, গ্রীষ্মকালেও সূর্য্য যখন নিস্তেজ। মেঘলা দিন বাদ দিয়ে শীতের দু'মাস পরেও

দুপুরবেলা চিলেকুঠিটি হয়ে থাকে শীতার্ত্ত মানুষের স্বর্গ আর সিঁড়িটা হয়ে থাকে আগুন। শীতগ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে যে শীতার্ত্ত, তারও পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেয়।

ডান পায়ের চেয়ে ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোট। হ্রস্ব পাখানি প্রথম ধাপে নামিয়েই সে তুলে নেয়। ব্যাপারটা মানবকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁতের ফাঁকে সজোরে শব্দ করে, 'ইস্!'

মানব বলে, 'গরম বুঝি?'

ইতি বলে, 'আগুন হয়ে আছে।'

ঘরে কুঁজোয় জল ছিল, একতলা থেকে মানবের নিজের বয়ে আনা জল। কুঁজো কাত করে মানব সিঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। যতক্ষণ সে জল ঢালতে থাকে ইতি কথা বলে না, সবটুকু জল মানব ঢেলে দেয় কিনা দেখবার জন্যে চুপ করে থাকে। কুঁজো খালি হয়ে গেলে মানবের হাত চেপে ধরে বলে, 'সব জল ঢেলে দিলে? একটু খেতাম আমি, তেষ্টা পেয়েছে।'

'এতক্ষণ খাওনি কেন?'

'এতক্ষণ কি মনে ছিল? জল দেখে খেয়াল হল।'

মানব একটু হাসে। চল্লিশ বছরের পুরোনো মুখখানায় সাতদিনের দাড়ি-গোঁপ জমেছে, বাঁ দিকের গালটি কবে যেন চিরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘাম মুছে মুছে মাজা বাসনের মত কপাল চিক্‌চিক্ করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঠোঁট দুটি কালো। দাঁতে আর মুখে বেহিসেবী পান খাওয়ার ইতিচিহ্ন। শান্ত নির্ম্মল হাসিটুকু তাই আরও অপূর্ব্ব মনে হয়,—ইতির মুখও সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, ব্রণের ছোট ছোট গর্ত্তভরা দুটি গালেই টোল পড়ে সৃষ্টি হয় দু'টি বড় গহ্বরের।

মানব বলে, 'চলো নীচে যাই। তুমি জল খাবে আমি কুঁজোটা ভরে নিয়ে আসব।'

ইতি বলে, 'তোমার তেষ্টা পায় নি?'

মানব বলে, 'পাবে পাবে, ভাবছ কেন?'

ধাপ দুটি ভাসিয়ে কুঁজোর জল ছাদে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, নালীর কাছাকাছি একসঙ্গে মিলে এতক্ষণে নালী দিয়ে নীচে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ছাদে শুকনো শ্যাওলা, আর কয়েকটি দুপুরের রোদ পেলেই আলগা হয়ে উঠে আসবে আর সন্ধ্যার পর মানবের পায়চারিতে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কুঁজো হাতে এক ধাপ নেমেই বোধ হয় আগামী সন্ধ্যায় নিজের পায়চারি করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে ওঠে মানবের, মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'সন্ধ্যার সময় আসবে একবার?'

'না এলে রাগ করবে?'

'রাগ? আর কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? এবার থেকে অভিমান করব।'

'তা হলে আসব না।'

মানব খুসী হয়ে বলে, 'সেই ভাল। আজ একা একা তারা গুণে অভিমান করব, কাল তুমি এসে আমার অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে করছে ইতি! কি রকম যে লাগছে আমার কি বলব!'

'আমারও।'

দৃষ্টির একটু গভীরতা এসেছে বৈকি মানবের, মনটা তো অন্তত শান্ত হয়েছে। দুজনেই যখন ছাদে নেমেছে, সে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ইতি?'

'না গো, না। কিসের কষ্ট?'

সন্ধ্যার পর না এসে ইতি তাকে অভিমান করবার সুযোগ দেবে, পরামর্শ হয়েছে এই। এখনই যেন মানবের অভিমান হয়, মুখখানা গম্ভীর করে সে বলে, 'তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কিনা, তাই বলছি।'

'আমিই বা কি এমন আকাশের পরী!'

অভিমান গাঢ় হয়, মানবের চোখ পর্য্যন্ত যেন ছল্ ছল্ করে।

'আকাশের পরী হলে তুমি আমার দিকে তাকিয়েও দেখতে না তো?'

'কি ছেলেমানুষ তুমি!'

আকাশে রোদ, ছাদ গরম। আবার মানবের মুখ হাসিতে ভরে যায়, ইতির কাঁধে মুখ রেখে কথা বলতে গিয়ে কিছু না বলাই সে ভাল মনে করে। কথা বলার চেয়ে কঠিন হাসি হেসে ইতিকে তাই হাসির জবাব দিতে হয়। একি আশ্চর্য্য যে নীচে নামবার কথা ভুলে যাওয়ার মত ভঙ্গিতে দুজনে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়িযে থাকতে পারে? পায়ের তলার ছাদটুকু ছাড়া আর সব যেন অনাবশ্যক হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে এই ছাদ,—দামী একটা হাউই পৃথিবী ছেড়ে যত উঁচুতে উঠতে পারে হয়তো তত উঁচুতে নয়, কিন্তু কে আর সে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে দামী হাউই ছেড়ে? আশেপাশের বাড়ীগুলি তো এত উঁচু নয়, এ বাড়ীর মত ইঁট বের করা নয় বলে কেবল দেখতে সুন্দর। কিন্তু সেটুকুও এবাড়ীর ছাদে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরই ভাল লাগে, চোখ মেললেই সমগ্রভাবে চোখে পড়ে। তা ছাড়া পাওয়া যায় আচ্ছন্ন, অভিভূত হওয়ার একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা।

'ইস্!'

এবার মানবের চমক লাগে।

'গরম বুঝি ?'

'আগুন হয়ে আছে।'

মানব আপশোষ করে বলে 'তোমাকে আজ খালি কষ্ট দিচ্ছি।'

'দিচ্ছই তো। খালি খালি কষ্ট দেওয়ার কথা বলছ।'

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়ির ছায়াতে নেমে যাওয়া মাত্র দুজনে যেন আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মানব বলে, 'সিঁড়িটা তো বেশ ঠাণ্ডা।'

ইতি-সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'গরম থেকে এলে কিনা। এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারিনি তোমার ঘরটা কি গরম।'

ধীরে ধীরে ইতি নামতে থাকে, প্রতি মুহূর্ত্তে এলিয়ে পড়তে চাওয়ার মত অলস অনিচ্ছুক পদে। সিঁড়ির মুখের কাছে তাপ ও আলো মেশার ফলে ছায়া একটু কম শীতল, কম ম্লান। প্রত্যেক ধাপ নামার সঙ্গে যেন বুঝতে পারা যায় ছায়া গাঢ় হচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে। কিন্তু এই গরমে কোন ছায়াই এমন শীতল হতে পারে না যে একটু আরাম দেওয়ার বেশী কিছু দিতে পারবে, ইতি কিন্তু একবার শিউরে ওঠে। জ্বরের রোগীর গায়ে কেউ যেন হঠাৎ বরফের ছেঁকা দিয়েছে।

তেতালার বারান্দায় বছরখানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটি চুষছিল চুষিকাঠি আর মেয়েটি চুষছিল ছেলেটির গোটাতিনেক আঙুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁকের ধাপটি একটু প্রশস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ইতি শিহরণটুকু সামলায়, তারপর ফিরে যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু উপক্রম করেই ক্ষান্ত হয়। ছুটে পালানোর এই আকস্মিক প্রেরণার জন্যই বোধ হয় মুখখানা একটু অপ্রসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, ততক্ষণে মানবও এদিকে ভদ্রতা করে ফেলেছে।

'মায়ে-পোয়ে কি হচ্ছে?'

মেয়েটি মাথায় কাপড় তুলে দেয়, মুখ থেকে ছেলের আঙুল খসে পড়ে। অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইতির দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'নরেন আজ কখন আপিস চলে গেল, জানতেও পারিনি।'

'উনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, আমার বোনের বাড়ী হয়ে আপিস যাবেন। আজ ধীরে সুস্থে রান্নাবান্না করেছি, একেবারে রাঁধবই না ভেবেছিলাম, হঠাৎ আমার দ্যাওর এসে পড়ল কিনা, তাই রেঁধেছি। রেঁধে বেড়ে না খাওয়ালে নিন্দে করতো তো? গিয়ে বলতো, ভাইকে তো পর করেইছি, বাড়ীতে এলে একবেলা খেতেও বলি না,—এইমাত্র চলে গেল। কেন এসেছিল জানেন? টাকা চাইতে! এদিকে আমার নিন্দে ছাড়া মুখে কথা নেই, দাদাকে বাড়ী না পেয়ে আমাব কাছে দিব্যি দশটা টাকা চেয়ে বসল। আমি বল্‌লাম আমি টাকা কোথায় পাব, দাদার কাছ থেকে নেবেন।—তুই ছাতে কি করছিলি ইতি?'

ইতি বলে, 'বাড়ী ভাড়া দিতে গিযেছিলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেই জন্য।'

ছেলের ভার ডান হাত হ'তে বাঁ হাতে গ্রহণ করে আবার মেয়েটি অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে ইতির দিকে খানিকক্ষণ চেযে থাকে, তারপর হঠাৎ একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়বার ভঙ্গিতে বলে, 'ও, হ্যাঁ—আমাদের ভাড়ার টাকাটাও তো দেওয়া হয়নি। কি করেই বা দেব, কাল তো মোটে মাইনে পেলেন। আজ দিতে বলে গেছেন। একটু দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিই, কেমন? খোকাকে একটু ধরবি ভাই ইতি?'

ইতির কোলে ছেলে দিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছায় বারকয়েক

ঝনাৎ করে শব্দ তুলে ঘরের ভিতরে মেয়েটি বাক্স খোলে। গোটা দুই বাক্স মোটে তার সম্পত্তি কিন্তু চাবির গোছায় চাবি যেন আঁটে না, আঁচল ছিঁড়ে পড়তে চায়। বাক্স খোলা আর বন্ধ করতেও কত যে অনাবশ্যক শব্দের সে সৃষ্টি করে বলবার নয়।

মানব নীচু গলায় ইতিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ভাড়া দিতে এসেছিলে নাকি?'

ইতি বলে, 'না। ওর কাছে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে তো?'

ইতিকে খোকা অনেকদিন থেকে চেনে, প্রায় আজন্ম। কিন্তু ইতি কোনদিন তার হাতের আঙুল মুখে পূরে চোষে না বলেই বোধ হয় ইতির কোলে থাকতে তার ভাল লাগে না। চুষিকাঠিটা প্রথমে নীচে পড়ে যায়, এদিক ওদিক চেয়ে খোকা মুখ বাঁকায়, তারপর মানব তার গালে একটা টোকা দেওয়া মাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বাক্সে চাবি দিতে দিতে মেয়েটি আনন্দে গদগদ হ'য়ে বলে 'আসছি রে আসছি, দুষ্টু কোথাকার। একমিনিট আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি না, আচ্ছা ছেলে হয়েছিস্ তো তুই?'

ভাড়ার টাকা, স্বামীর লিখে রাখা রসিদ আর এক কলম কালি নিয়ে খোকার মা বারান্দায় আসে, মানবকে টাকা গুণে দিয়ে রসিদে তার সই নেয়, তারপর ছেলেকে কোলে করে বলে 'এতটাকা ভাড়া তো পান, কি করেন টাকা দিয়ে? সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এই গরমে একা একা চিলেঘরে কি করে থাকেন আপনি! আমি হলে তো পারতাম না।'

মানব ভাড়ার টাকা কোমরে গুঁজে বলে, 'না পেরে উপায় কি, খোকার বাবার মত আমি তো চাকরী করি না।'

খোকার মা চোখ বড় বড় করে বলে, 'আপনার আবার চাকরী! একমাসে আপনি যা সুদ পান, ওঁর মাইনের তা ক'গুণ কে জানে! একটু

শুইগে' খোকাকে নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে তো তোকে ডাকব ইতি। পাখীটার ঠোঁট আর পা দুটো ভাল হচ্ছে না একটু দেখিয়ে দিস্। কটা করে ঘর বুনতে বলেছিলি ভুলে গেছি ভাই, যা দুষ্টুমি করে খোকা!'

মানব বলে, 'আরেকজন দুষ্টুমি করে না?'

'করে না?'—ফিক্ করে হেসে ফেলে পাক দিয়ে ঘুরেই খোকার মা ঘরের ভিতরে চলে যায়। কুঁজোটা তুলে নিয়ে মানব সিঁড়ির এক ধাপ নেমে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইতি নীরবে আসে। সমতল বারান্দায় ছোট বড় পা নিয়ে চলার ভঙ্গিটি তার বেশ। অন্য সব মেয়ে যেন শুধু চলে। ইতি একটা অজানা ছন্দে দুলে দুলে চলে। কোলে ছেলে নেই ইতির, আঁচলে নেই চাবির ভার, তবু বুকে পিঠে কাঁখে ছেলে যেন আছে তার অনেকগুলি, আঁচলে বাঁধা আছে সে যত ভার বইতে পাবে না তার চেয়ে বেশী ভাবি চাবির গোছা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, 'তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী আছে।'

'হ্যাঁ।'

মানব রসিকতা করে বলে, 'অন্য কোন ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।'

'হ্যাঁ।'

'রাগ হল নাকি, ভাড়ার কথা বললাম বলে?'

'না না, রাগ কিসের?'

সিঁড়ি বেয়ে তেতালায় নামার শিথিল এলায়িত ভঙ্গি এখন দোতলায় নামার সময় স্খলিত পদে নামার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাও যেন কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

মানব মুখ ভার করে বলে, 'অত হিসেব করে কথা বলা আমার আসে না। যা মনে আসে বলে ফেলি। কি এমন বললাম যে তোমার মুখ ভার হয়ে গেল ?'

ইতি একটু হাসে। হাসলে মুখের ভার হাল্কা হয়।

'মুখ আবার ভার হল কোথায় ? কি ছেলেমানুষ তুমি ! তোমার কথায় কি আর মুখ ভার করেছি, মুখ ভার করেছি তেতলার ওই লক্ষ্মী-ছাড়ীর কথায়। খোকার বাবা তো এদিকে মাইনে পায় তেষট্টি টাকা, অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে !'

সুতরাং মানবও হাসে। ইতির কথায় স্ত্রী-চরিত্রের একটা স্থূল দিক ফুটে উঠেছে আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পেরেছে বলে গর্ব্ব আর আমোদ অনুভব করে। ইতিকে নাড়া দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রের আরও দুটো দিক আবিষ্কারের আশায় বলে, 'কেন, নরেনের বৌ বেশ লোক।'

'বেশ না ছাই। সুখে আছে তাই, আমার মত পোড়াকপাল তো নয়।'

'তোমার পোড়াকপাল নাকি ?'

দুজনেই থমকে দাড়ায়। ইতি পিছনে হেলে যায় সাপের ফণা ধরার মত, বলে, 'কি বললে ?'

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমার পোড়াকপাল বলছ, আমার জন্য তো ?'

সাপের ফোঁস করার মতই ইতি সজোরে নিশ্বাস ছাড়ে, কিন্তু ছোবল মারার বদলে বয়স্কা নারীর চিরন্তন ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'তোমার সঙ্গে আর পারলাম না। মা বাবা ভাই বোনেদের কথা ভেবে ওকথা বলেছি, কি কষ্টে আছে সবাই বল তো ? নইলে, আমি তো আজ রাজরাণী। অবিশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরাণী নই, তোমার জন্যে রাজরাণী।'

তেতলায় মানুষ আছে, দোতালায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই—তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি আমার রাজা।'

দুজনে দোতলায় নামামাত্র উপরের যে ঘরটিতে খোকাকে নিয়ে খোকার মা শুতে গেছে ঠিক তার নীচের ঘর থেকে বার হয়ে আসে মাঝবয়সী একটি মহিলা। মহিলাটি এত মোটা যে পদক্ষেপে মেঝে না কাঁপলেও দুম্ দাম্ শব্দ হয়। তবে এখন .পা ফেলার শব্দটা তার একটু জোরালো, হয়তো একটু বেশী জোরেই সে এখন পা ফেলেছে।

'কোথায় ছিলি ইতি ?'

'তেতলায় ছিলাম, খোকার মার কাছে।'

'ছাই ছিলি, তিনবার ওপরে নীচে তোকে খুঁজে এসেছি।'

'তখন হয় তো চিলে ঘরে গেছলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয তো ইতি, সেইজন্য। এতক্ষণ তো খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম, .জিগ্যেস্ করে আয় খোকার মাকে। খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম না মানব বাবু ?'

মানব বলে, 'করছিলে বৈকি।'

ইতি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি বললেন না কুঁজোয জল ফুরিয়ে গেছে ? আমি বললাম না, চলুন নীচে গিয়ে কুঁজোতে জল ভবে দিচ্ছি ?'

মানব মাথা নেড়ে সায় দেয।

মোটা মেযেটির রঙ্ খুব ফর্সা! এতক্ষণ মুখখানা তাব লাল হয়ে ছিল, এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরো জোরে দুমদাম পা ফেলে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে, দরজা বন্ধ করে দড়াম করে খিল তুলে দেয়।

পরক্ষণে খিল খুলে আবার বের হয়ে আসে।

'তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া? খোঁড়া পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ী যাস্ না কেন তুই?'

মানব বলে, 'সুধা, আজ হাসপাতালে যাওনি?'

সুধা বলে, 'দেখতে পাচ্ছনা, যাইনি?"

মানব আবার বলে, 'আজ ডিউটি নেই বুঝি?'

সুধা হঠাৎ কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলে, 'ডিউটি থাক বা না থাক, তোমার কি?'

মানব শান্তভাবে বলে, 'না, এমনি বলছি। ভাড়ার টাকা দেবে নাকি আজ কিছু?'

সুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের চারদিকের অতিরিক্ত মাংস ফেলে ছোট ছোট চোখ দুটিকে বড় করবার চেষ্টা করে।

'ভাড়া চাইচ? ভাড়া!'

মানব মৃদু একটু হেসে বলে, 'তুমিই তো বলেছিলে আজ কিছু দেবে।'

'এখনও মাইনে পাই নি।'

'বেশ মাইনে পেলে দিও। নগেনকে ফিরে আসবার জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, না সুধা?'

সুধা মুখ সাদা করে বলে, 'কে বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি?'

'কাগজে দেখলাম। বেশ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একা আর কতকাল চালাব, আমার জন্যে না হোক ওদের কথা ভেবে ফিরে এসো, ইতি তোমার সুধা। তোমার বিজ্ঞাপন যদি চোখে পড়ে সুধা, যেখানে থাক নগেন ছুটে আসবে।'

সুধা আর কথা বলে না, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তার পদক্ষেপের শব্দও হয় কোমল, দরজা বন্ধ করার শব্দও হয় মৃদু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করে ইতি বলে, 'সিঁড়ি যেন আর ফুরোতে চায় না।'

'কষ্ট হচ্ছে ?'

'থাক, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।—সুধাদির ক'মাসের ভাড়া বাকী আছে ?'

'ক'মাস আবার, দু'একমাস। কি করবে বল বেচারী, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চারদিক অন্ধকার দেখছে। নার্সগিরিতে কি পয়সা আছে ?'

'তুমি দেওনা কেন ?'

'আমি কেন দেব ? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক ? আর দু'মাস দেখব, ভাড়া যদি না মিটোয়, পষ্ট বলে দেব বিনা ভাড়ায় যে-বাড়ীতে থাকতে পাবে সেখানে থাকোগে, আমার এখানে ওসব চলবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় নামার স্খলিত ভঙ্গি ইতির এবার নিজের হঠাৎ মুচড়িয়ে ভেঙে পড়বার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে সিঁড়িও ফুরিয়ে আসছে, প্রাণপণ চেষ্টায় মানবের বাহুমূলে আস্তে একটি চড় মেরে মৃদু হেসে সে তাই বলে, 'কি দুষ্টুই তুমি ছিলে।'

তেতলায় খোকার মা খোকাকে যেমন করে দুষ্টু বলেছিল, ঠিক তেমনি করে বলে। তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কই দিলে না ?'

মানব বলে, 'কি ?'

'মা যে দশ টাকা ধার চেয়েছে ? ভাড়ার টাকা তো পেলে, তাই থেকে দাও না ?'

মানব মৃদু হেসে কোমরের গোঁজা টাকা বার করে ইতিকে দশটা টাকা দেয়। ইতি ঘাড় গুঁজে নামতে থাকে।

একতলার বারান্দায় নেমে দেখা যায়: বারান্দায় মাদুরে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ইতির মা ঘুমুচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বছরতিনেকের একটা উলঙ্গ ছেলে, সর্ব্বাঙ্গে তার অনেকগুলি পাঁচড়া। বারান্দার অপর প্রান্তে এঁটো বাসন পড়ে আছে। ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভাল না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভাল না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।

ইতির মার ঘুম ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজে থাকা। মটকা মেরে নয়, শ্রান্তিতে আর দুর্ব্বলতায়।

চোখে মেলে ইতির মা বলে, 'ইতি এলি?'

বলে মানবের মুখের দিকে চেয়ে ইতির মা বলে, 'সকাল বেলা এক কুঁজো জল নিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেছে? ইতি, যা তো মা, কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে আয়। ওসব কি পুরুষ মানুষের কাজ!'

মানব বলে, 'সিঁড়ি ভাঙতে ইতির কষ্ট হয়, আমিই নিয়ে যেতে পারব।'

ইতির মা একথা শুনতে পায় না। মেয়ের পদমূলে চোখ রেখে বলে, 'তোর গায়ে রক্ত কিসের লো ইতি?'

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, 'পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।'

মানব বলে, 'তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি?'

প্রশ্ন শোনবামাত্র ইতি বিনা ভূমিকায় ক্ষেপে যায়। আর্ত্তনাদ করার মত বলতে আরম্ভ করে, 'হ্যাঁ হয়েছে, একশ'টা হয়েছে। কি করবে তুমি?

ঘেন্না করবে? করগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে? দেখছ না ভাই-এর গায়ে পাঁচড়া, জাননা ভাইকে আমি কোলে নিই? পাঁচড়া হবেনা তো কি হবে আমার?'

তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও ছাখে না।

'ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বলে একেবারে তিন চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মত মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।